গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-১
www.rdcd.gov.bd

নং-৪৭.০০.০০০০.০৩১.০৫.২৬০.১৯-০২

তারিখঃ ১৮ পৌষ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সভার বিজ্ঞপ্তি

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮: সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ-এ উল্লিখিত বিভিন্ন লক্ষ্য ও পরিকল্পনার আলোকে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিদ্যমান কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে আগামী ০২.০১.২০১৯ রোজ বুধবার **সকাল ১১.০০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) এক সভা অনুষ্ঠিত** হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব **মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার।**

০২। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে স্ব-স্ব সংস্থা/অধিদপ্তরের প্রধান-কে সুচিন্তিত মতামত প্রদানের লক্ষ্যে প্রাক-প্রস্তুতি নেয়ার অনুরোধ রইল।

০১/০১/১৯
(মোঃ মিজবাহ উদ্দিন মোল্লা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ +৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৬
(e-mail: admin1.section@rdcd.gov.bd)

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):-

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ ও বাঃ)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী ভবন, ৫, কাওরান বাজার, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা।
০৪। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্ক ইউনিয়ন), ঢাকা।
০৬। প্রকল্প পরিচালক, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩, পশ্চিম অংশ) ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা/প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-৩য় পর্যায়) প্রকল্প, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
০৮। মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
০৯। যুগ্ম-সচিব (আইন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি:, ৯/ডি, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
১১। মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় **(মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।**
১২। ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।
১৩। ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং-০৫, এভিনিউ-০৩, রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা।
১৪। উপসচিব (প্রশাসন/বাজেট/এপিএ/প্রতিষ্ঠান শাখা-২/প্রশাসন, সমবায়/উন্নয়ন/প্রশাসন শাখা-১/আইন/প্রতিষ্ঠান-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিবের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ **(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।**
১৬। উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ **(মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।**
১৮। উপ-সচিব (নিরাপত্তা অধিশাখা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(সচিবালয়ে প্রবেশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।**
১৯। সিস্টেম এনালিস্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**।
২০। সিঃ সহঃ সচিব/সহকারী সচিব, উন্নয়ন শাখা/আইন শাখা/প্রতিষ্ঠান শাখা-১/বাজেট শাখা-১ ও ২,/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১/২/৩/৪/৫/৬, এ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২২। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। সহকারী প্রোগ্রামার- ১/২, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। নির্বাহী সচিব, জাতীয় পল্লী উন্নয়ন সমবায় ফেডারেশন, ফেডারেশন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
২৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, প্রশাসন শাখা-১ (গ্রহণ ও প্রেরণ অংশ), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সভায় ৪৫ জন অতিথির আপ্যায়নের অনুরোধসহ)।
২৬। অফিস কপি।

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা

জয় বঙ্গবন্ধু

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার

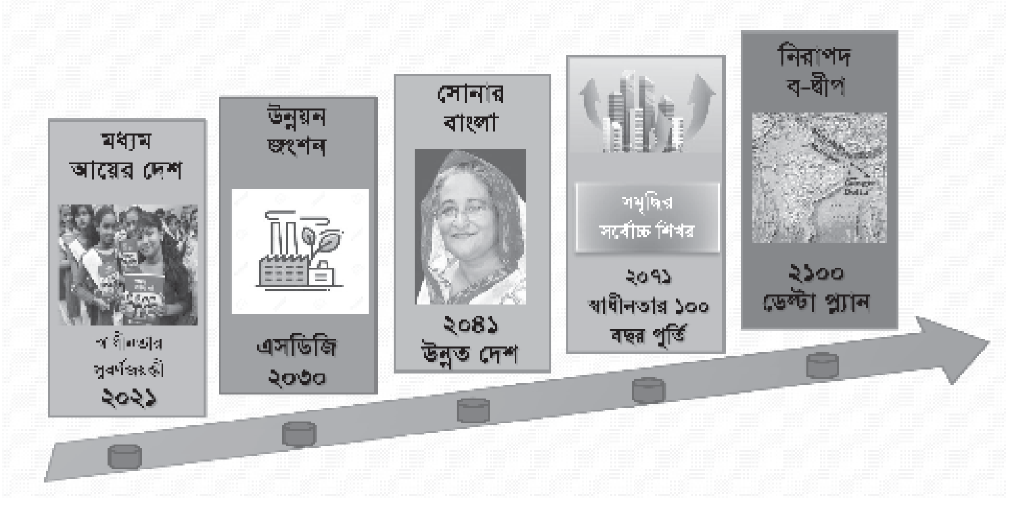

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সূচি

১.	আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার	৫
২.	পটভূমি	৬
২.১	গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর (জুন ১৯৯৬-জুলাই ২০০১) : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুবর্ণ সময়	৮
২.২	বিএনপি-জামাত জোট সরকার (অক্টোবর ২০০১-নভেম্বর ২০০৬) : লুণ্ঠন, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ	৯
২.৩	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উত্তরণ	১১
২.৪	আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩) : সংকট উত্তরণ এবং দিনবদলের পথে যাত্রা	১২
২.৫	আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৮) : উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ	১৩
৩.	সরকার পরিচালনায় দুই মেয়াদে (২০০৯-১৮) সাফল্য ও অর্জন এবং আগামী পাঁচ বছরের (২০১৯-২৩) লক্ষ্য ও পরিকল্পনা	১৫
৩.১	গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ	১৫
৩.২	আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা	১৬
৩.৩	দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন	১৭
৩.৪	জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা	১৮
৩.৫	দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ	২০
৩.৬	সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদক নির্মূল	২১
৩.৭	স্থানীয় সরকার : জনগণের ক্ষমতায়ন	২১
৩.৮	সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন	২৩
৩.৮.১	কৌশল ও পদক্ষেপ	২৬
৩.৯	অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট)	২৯
৩.১০	**'আমার গ্রাম – আমার শহর'** : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ	৩০
৩.১১	তরুণ যুবসমাজ : **'তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'**	৩১
৩.১২	নারীর ক্ষমতায়ন	৩৪
৩.১৩	দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস	৩৫
৩.১৪	কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি : খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা	৩৮

৩.১৫	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	৪১
৩.১৬	শিল্প উন্নয়ন	৪৪
৩.১৭	শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি	৪৬
৩.১৮	শিক্ষা	৪৭
৩.১৯	স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ	৫০
৩.২০	যোগাযোগ	৫২
৩.২১	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫৬
৩.২২	সমুদ্র বিজয় : ব্লু-ইকোনমি – উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচন	৫৮
৩.২৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা	৫৮
৩.২৪	শিশু কল্যাণ	৫৯
৩.২৫	প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ	৬০
৩.২৬	মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন	৬২
৩.২৭	সংস্কৃতি	৬৩
৩.২৮	ক্রীড়া	৬৪
৩.২৯	ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়	৬৫
৩.৩০	গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ	৬৬
৩.৩১	প্রতিরক্ষা : নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সুরক্ষা	৬৮
৩.৩২	পররাষ্ট্র	৬৯
৩.৩৩	এনজিও	৭১
৪.	এমডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-৩০)	৭২
৫.	ব-দ্বীপ বা ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০	৭৪
৬.	জননেত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি	৭৫
৭.	দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান	৭৮

১. আমাদের বিশেষ অঙ্গীকার

আমার গ্রাম – আমার শহর : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি : তরুণ-যুবসমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর ও কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ

নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা ও শিশু কল্যাণ

পুষ্টিসম্মত ও নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা

সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদক নির্মূল

মেগা প্রজেক্টসমূহের দ্রুত ও মানসম্মত বাস্তবায়ন

গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুদৃঢ় করা

দারিদ্র্য নির্মূল

সকল স্তরে শিক্ষার মান বৃদ্ধি

সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি

সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চয়তা

সার্বিক উন্নয়নে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা

আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা – লক্ষ্য যান্ত্রিকীকরণ

দক্ষ ও সেবামুখী জনপ্রশাসন

জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

ব্লু-ইকোনমি – সমুদ্রসম্পদ উন্নয়ন

নিরাপদ সড়কের নিশ্চয়তা

প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও অটিজম কল্যাণ

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন – সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

> **“এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায় । এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায় । এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায় ।”**
>
> **– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান**

২. পটভূমি

মহান স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ পূর্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে রূপকল্প-২০২১ সফলভাবে সম্পন্ন করা জাতির কাছে আমাদের অঙ্গীকার। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অর্জনের মাধ্যমে দেশ এখন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, মানুষের আয় ও আয়ু দুটোই বেড়েছে এবং ছেলেমেয়ে সবার জন্য শিক্ষা ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তার বিধান করা হয়েছে। ঘরে ঘরে এখন বিদ্যুতের আলো, দুর্ভিক্ষ ও মঙ্গা নাই, গ্রামে গ্রামে পাকা রাস্তাঘাট, ডিজিটাল যোগাযোগের ফলে মানুষ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহিদ ও অগণিত মা-বোনের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বর্তমানে উন্নীত হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশের কাতারে শামিল হওয়ার পথে ধাবমান।

এসব পর্বতসম অর্জনের সফল রূপকার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আর এর অগ্রভাগে থেকে ইস্পাত কঠিন সুদৃঢ় নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের সার্থক উত্তরসূরি তারই সুযোগ্য কন্যা বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্রনায়ক, মানবতার জননী, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সভাপতি জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এ বিশ্বনেতার সুকৌশলী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের সুখ্যাতি লাভ করেছে এবং উন্নয়নের সুফল থেকে যাতে কেউই বঞ্চিত না হয় সে-লক্ষ্যে সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুসমন্বিত কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করে চলছে। সরকারের বহুমাত্রিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাময় সম্পদ তরুণ-যুবসমাজের মেধা, সৃজনশীলতা, মনন ও ধীশক্তির উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা ও ৩ নভেম্বর জাতীয় চার নেতার হত্যা-পরবর্তী অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারী সরকারের দুঃশাসন ও অপশাসন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উৎসারিত উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়। খুনি মোশতাক ও জিয়া চক্র স্বাধীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক ধারায় ঠেলে দেয়। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে ভূ-লুণ্ঠিত করা হয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বিএনপি রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করে রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। হত্যা, ক্যু, পাল্টা ক্যু, খুন, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, লুটপাটের ফলে সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত হয় দেশ। কৃষি খাতের স্থবিরতার ফলে খাদ্য ঘাটতি ও অপুষ্টি অনাহার লেগেই থাকে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সূচিত স্বৈরশাসন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী ধারার অবসান হয়। রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বসমাজে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়ায়। এই শাসনামল বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, ২০০১ সালে ষড়যন্ত্রমূলক ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট পুনরায় ক্ষমতা দখল করে এবং উন্নয়নের বিপরীতে নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের ধারাই অব্যাহত রাখে। নির্বাচনের পরই নিরীহ ভোটার, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘু জনগণের ওপর দমন-পীড়ন, খুন-ধর্ষণ, সন্ত্রাস-লুটপাট চলতে থাকে। ক্ষমতার প্যারালাল কেন্দ্র 'হাওয়া ভবন' থেকে লুটপাট ও সন্ত্রাস চূড়ান্ত পর্যায়ে নেওয়া হয়। ২০০৩ সালে সরকারি মদদে একযোগে ৬৩ জেলার ৫০০ জায়গায় বোমা হামলা এবং ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা প্রভৃতি ওই সরকারের প্রতিহিংসা ও চরম নিষ্ঠুরতার নিকৃষ্ট উদাহরণ। খালেদা-নিজামী সরকার নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার জন্য ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার, বশংবদদের দিয়ে তথাকথিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনসহ 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর ব্যবস্থা করে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে।

বিএনপি-জামাত জোটের এসব অপতৎপরতার ফলেই ২০০৭ সালে ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়। ক্ষমতাসীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাড়াবাড়ি, খামখেয়ালি, জবরদস্তি, বিরাজনীতিকরণের হীন প্রচেষ্টা ও 'মাইনাস-টু' ফর্মুলা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে সর্বজনস্বীকৃত অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ আসনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় দেশের ইতিহাসে প্রথম কোনো একটি দলের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুস্পষ্ট কর্মসূচি জনপ্রিয় নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ' বাস্তবায়নের ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞ। এতে পরাজিত শত্রুরা প্রমাদ গোনে। শুরু হয় ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত।

ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই অরাজকতা ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে অবৈধ শক্তিকে ক্ষমতায় আনার হীন উদ্দেশ্যে ঘটানো হয় বিডিআর বিদ্রোহ। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য নিরসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন, মাথাপিছু আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের সফল অগ্রযাত্রা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, যার চরম প্রকাশ ঘটে ২০১৪-এর নির্বাচনপূর্ব অযৌক্তিক ও জনসম্পৃক্ততাহীন আন্দোলন, আগুন সন্ত্রাস, জনগণের সম্পদ বিনষ্ট, নিরীহ মানুষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হত্যার মধ্যদিয়ে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সরকার অতি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে এসব চক্রান্ত সামাল দেয় এবং সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় পুনর্বহাল হয়। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অগ্রযাত্রা। বিশ্বসমাজে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ায় বাংলাদেশ।

এই অভূতপূর্ব সাফল্য ও অর্জনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই হবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের দেশপ্রেমিক কর্তব্য। ২০২১ সালের আগেই মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)' অর্জন, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ এবং সর্বোপরি 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা' তথা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন জাতির সামনে বিকল্প কিছু আর হতে পারে না। দেশ আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির গতিপথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০০৮ থেকে টানা দুই মেয়াদে ১০ বছর জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার জনকল্যাণমুখী ও সুসমন্বিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সমতা ও ন্যায়বিচারভিত্তিক গণতান্ত্রিক দেশ বিনির্মাণের পথে জাতিকে অগ্রসরমান রেখেছে। জাতির এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আজ সময়ের দাবি। তাই আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধে ও বর্তমান উন্নয়নে নেতৃত্বদানকারী সর্ববৃহৎ ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ প্রিয় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে **'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'** ইশতেহার-২০১৮ উপস্থাপন করছে।

২.১ গৌরবোজ্জ্বল পাঁচ বছর (জুন ১৯৯৬-জুলাই ২০০১) : স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুবর্ণ সময়

পঁচাত্তর-পরবর্তী সকল গ্লানি, কলঙ্ক, ব্যর্থতা পিছনে ফেলে সুদীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামল জাতি, রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশ পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে নিরপেক্ষ বলে সুপরিচিত বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা, সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু করা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর বদলে সংসদ সদস্যদের চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি প্রশ্নোত্তর প্রথা চালু করা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ফলে সেখানে দুই যুগের ভ্রাতৃঘাতী হানাহানি-রক্তপাত বন্ধ হয়। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে ইতিহাসের কলঙ্ক মোচন করা হয়। ফলে জাতির পিতার হত্যার বিচারকার্য সম্পন্ন করার বাধা দূর হয়।

প্রথমবারের মতো দেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে। মুদ্রাস্ফীতির হার নেমে আসে ১.৫৯ শতাংশে। পাঁচ বছরে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ হারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি। জনগণের মাথাপিছু আয় ২৮০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ৩৮৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। মানব দারিদ্র্যসূচক ১৯৯৫-৯৬ সালের ৪১.৬ শতাংশ থেকে ২০০১ সালে ৩৪ শতাংশে নেমে আসে। একই সময়ে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৫৮.৭ বছর থেকে ৬২ বছরে উন্নীত হয়। সাক্ষরতার হার পূর্বতন বিএনপি আমলের ৪৪ শতাংশ থেকে বেড়ে আওয়ামী লীগ আমলে ৬৫ শতাংশে উন্নীত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি করা হয়। স্থাপিত হয় নতুন নতুন শিল্প-কারখানা ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা। বেড়ে যায় বৈদেশিক বিনিয়োগ।

দারিদ্র্য বিমোচনে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম 'বয়স্ক ভাতা', 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা ভাতা', 'অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা', 'আশ্রয়ণ প্রকল্প', 'গৃহায়ন', 'আদর্শ গ্রাম', স্বাধীনতার পরপরই বঙ্গবন্ধুর সময় চালু হওয়া 'গুচ্ছগ্রাম' ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সত্যিকারের অসহায় হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ায় সরকার। এছাড়াও 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'কর্মসংস্থান ব্যাংক'সহ আত্মকর্মসংস্থানমূলক বহুমুখী সৃজনশীল প্রকল্প ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

পঁচাত্তর-পরবর্তী শাসকদের লুটপাট, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং এডহক-ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার ধারা পরিহার করে শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, কৃষিনীতি, কৃষি সম্প্রসারণনীতি, স্বাস্থ্যনীতি ও জ্বালানিনীতির মতো প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রচেষ্টায় মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি অর্জন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা। ক্রীড়াক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট ও ওয়ানডে ক্রিকেট খেলার মর্যাদা লাভ করে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ, বাংলাদেশের ডি-৮ গ্রুপের নেতা নির্বাচিত হওয়া, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইউনেস্কো ফেলিক্স হুফে বইনি শান্তি পুরস্কার ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে খাদ্য উৎপাদনে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার 'সেরেস' পদক লাভ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ লাভ করে এক গৌরব ও মর্যাদার আসন। বিশ্বসভায় গড়ে ওঠে সেক্যুলার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের এক নতুন ইমেজ।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সেবারই প্রথম একটি নির্বাচিত সরকার তার পাঁচ বছরের পূর্ণ মেয়াদ শেষে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার স্বার্থে সংবিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই ক্ষমতা নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের কাছে হস্তান্তর করে। পঁচাত্তর-পরবর্তী হুকুমের নির্বাচন এবং সেনা ও স্বৈরশাসক নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিপরীতে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক ধারায় দেশকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে অমোচনীয় কালিতে লিপিবদ্ধ থাকবে।

২.২ বিএনপি-জামাত জোট সরকার (অক্টোবর ২০০১-নভেম্বর ২০০৬) : লুণ্ঠন, দুঃশাসন ও দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ

বিচারপতি লতিফুর রহমানের পক্ষপাতদুষ্ট তথাকথিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সূক্ষ্ম কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোটের ক্ষমতায় আসাটা ছিল জাতির জন্য চরমতম কলঙ্ক ও দুর্ভাগ্যের। পরাজিত শক্তি পঁচাত্তরের পর ক্ষমতা দখল করে যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, নির্বাচনের পর থেকে সেই একই কায়দায় সুপরিকল্পিতভাবে নির্বিচারে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, নিরীহ ভোটার, বিশেষভাবে সংখ্যালঘু ও মহিলা ভোটারদের ওপর পাশবিক অত্যাচার, লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ তথা এথেনিং ক্লিনজিং চালানো হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশের সামনে যে অমিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছরের দুঃশাসনের ফলে সেই সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। দেশ পরিণত হয় মৃত্যু উপত্যকায়।

বস্তুতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য ও নির্মূল এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতীয় চার মূলনীতিকে সমূলে উৎপাটিত করার সুপরিকল্পিত নীলনকশার অংশ হিসেবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই একের পর এক সশস্ত্র আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গ্রেনেড হামলা ছিল সেই নৃশংস বর্বরতার চরমতম বহিঃপ্রকাশ। এই হামলায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত ও ৫০০ জন আহত হন। একই উদ্দেশ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য শাহ এএমএস কিবরিয়া, শ্রমিক নেতা

ও সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম ও মমতাজ উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতাকর্মী এবং মানিক সাহা, গোপাল কৃষ্ণ মুহুরী, জ্ঞানজ্যোতি মহাথেরো ও প্রফেসর ইউনুস প্রমুখ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সংখ্যালঘু পুরোহিতদের বিএনপি-জামাত জোট ও তাদের ক্যাডার সন্ত্রাসীরা হত্যা করে। সরকারি মদদে শায়খ আবদুর রহমান ও তথাকথিত 'বাংলাভাই' এবং মুফতি হান্নান গংদের নেতৃত্বে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান, গ্রেনেড হামলা ও বোমাবাজিসহ একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নতুন টার্গেটে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হয় ভূ-লুণ্ঠিত। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আইনের শাসন ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চিহ্নিত হয় অকার্যকর রাষ্ট্র, সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে।

বিএনপি-জামাত জোট শাসনামলের পাঁচ বছরে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। বিগত আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় দ্রব্যমূল্য ১০০-২০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ১.৫৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯২ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৫.৪ শতাংশে। পাঁচ বছরে জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি বাড়লেও খাদ্য উৎপাদন আওয়ামী লীগ আমলের ২ কোটি ৬৮ লাখ টন থেকে কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ৬১ লাখ টন। দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমে আবার ০.৫০ শতাংশে নেমে আসে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছর ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরসহ মোট সাত বছরের শাসনামলে নতুন করে দরিদ্র মানুষের তালিকায় যুক্ত হয় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদের ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় এলেও দুর্নীতি-লুণ্ঠন ও দুর্বৃত্তায়নই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রশ্রয়ে তার পুত্র তারেক রহমানের নেতৃত্বে 'হাওয়া ভবন'কে রাষ্ট্রক্ষমতার সমান্তরাল কেন্দ্রে পরিণত করা হয় এবং এটি হয় দেশের সমুদয় দুর্নীতি-সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রসূতিকেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান কালো টাকার অধিকারী হয়ে পড়েন এবং তাদের সন্তানরা ও সরকারের মন্ত্রী-নেতারা বিদেশে অর্থপাচারের সঙ্গে যুক্ত হন। বিএনপি-জামাত জোটের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতাকর্মী এবং দলীয় প্রশাসনের অকল্পনীয় দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, লুটপাট, চাঁদাবাজি প্রভৃতির ফলে টিআইবি পরপর পাঁচবার বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

সর্বক্ষেত্রে সরকারের দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনা এবং দুঃশাসনের ফলে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। পাঁচ বছরে জোট সরকার ১ মেগাওয়াটও বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। বরং বিদ্যুৎ খাতে লুটপাট ও অপব্যয় হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকা। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে সৃষ্টি হয় চরম সংকট। বিদ্যুতের দাবি জানাতে গেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার কানসাটে ২০ কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বস্তুত জোট শাসনামলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও নারী উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হয় স্থবিরতা। জোট সরকার পদচ্যুতি, বাধ্যতামূলক অকালীন অবসর প্রদান, নিয়মবহির্ভূত পদোন্নতি প্রদান ও নিয়োগ দান করে জনপ্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, বিচার বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ রাষ্ট্র ও সরকারের সকল অঙ্গপ্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। দলীয়

অনুগত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির চাকরির বয়সসীমা দুই বছর বৃদ্ধি করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দলীয় লোককে বসানোর হীন উদ্দেশ্যে অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের বিচারপতি নিয়োগ করে সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা ও মানুষের শেষ ভরসাস্থল বিচার বিভাগকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিএনপি-জামাত জোট ব্রুট মেজরিটির জোরে সংসদকে অকার্যকর এবং সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে আজ্ঞাবহ দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। সংবিধান ও সুপ্রিমকোর্টের রায় উপেক্ষা করে ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটারসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩ শতাধিক দলীয় ক্যাডারকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও কারচুপিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যার ফলে পুরো নির্বাচন-ব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ভূ-লুণ্ঠিত হয় জনগণের ভোটের অধিকার।

২.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল : গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও উত্তরণ

বিগত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বাধাবিঘ্নহীন করতে সংবিধান অনুযায়ী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, ঠিক এর বিপরীতে গণতন্ত্রের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করার কলঙ্কজনক কাজটিই করে বিএনপি-জামাত জোট নেত্রী খালেদা জিয়া। পাতানো নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে নানা নাটকের পর পুতুল প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি-জামাত জোটের নীলনকশা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে। ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নীলনকশার নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করতে বিক্ষুব্ধ জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। সৃষ্টি হয় গণজাগরণ। ভোট ডাকাতি করে নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা দখলের হীন উদ্দেশ্য নিয়ে ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার হত্যা-খুন, জুলুম-সন্ত্রাসের মাধ্যমে দেশকে সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়। বিএনপি-জামাত জোটের এই দুরভিসন্ধি ও অসৎ উদ্দেশ্যের ফলেই ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়। দেশে ড. ফখরুদ্দীনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন হলে জরুরি অবস্থা জারি করা হয় ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ থাকে।

১১ জানুয়ারি ২০০৭-এর ক্ষমতার পটপরিবর্তন যেমন নির্বাচন প্রশ্নে বিদ্যমান সংকট মোচনের পথ উন্মুক্ত করে, তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ছত্রছায়ায় মহলবিশেষের বাড়াবাড়ি, জবরদস্তি, বিরাজনীতিকরণের প্রচেষ্টা এবং 'মাইনাস-টু' ফর্মুলা বাস্তবায়নের ষড়যন্ত্র দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তোলে। ক্ষমতার ছত্রছায়ায় 'কিংস পার্টি' গড়ে তোলা এবং খালেদা জিয়া, তারেক জিয়া ও বিএনপি-জামাতের অপকর্ম-দুষ্কর্ম আড়াল করার হীন উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমে টার্গেট করা হয় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। এই সরকার বঙ্গবন্ধু-কন্যার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, কারাবন্দি করে জীবন বিপন্ন করার অপচেষ্টা চালায়। ফলে পুরো দৃশ্যপট বদলে যায়। দেশে-বিদেশে গড়ে ওঠে তীব্র জনমত। চলে বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। জননেত্রী শেখ হাসিনার অনমনীয় আপসহীন সাহসী ভূমিকার ফলে কার্যত

মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনাকে রাজনীতি থেকে, তার প্রিয় স্বদেশবাসীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

আর্মি ও নিরপেক্ষ দাবিদার সুশীল সমাজ সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দুই বছর ক্ষমতাসীন থাকে। এই সরকারের একটি সফল কাজ হলো ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী এ কাজটি সম্পন্ন করায় দেশবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়। সরকার নির্বাচনী আইন এবং প্রক্রিয়ারও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর একটি অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও দেশবাসীর কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে এই বিজয় একেবারে সহজসাধ্য ছিল না। আবারও বিজয়ী হয় জনতার আন্দোলন। ফলে দেশে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ সুগম ও দিনবদলের শুভ সূচনা হয়।

২.৪ আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩) : সংকট উত্তরণ এবং দিনবদলের পথে যাত্রা

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক বিজয় বিএনপি-জামাত জোট সরকারের চরম দুর্বৃত্তায়ন ও লুটপাট এবং সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চরম অব্যবস্থাপনা থেকে সৃষ্ট গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে বাঙালি জাতির জন্য সম্ভাবনার এক স্বর্ণদুয়ার উন্মোচন করে। ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীকে সামনে রেখে জননন্দিত নির্বাচনী ইশতেহার 'দিনবদলের সনদ'-এর বাস্তবায়ন শুরু হলে দেশ আবারও ১৯৯৬-২০০১ শাসনামলের মতো আলোকোজ্জ্বল পথে যাত্রা শুরু করে। রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা করে উন্নয়নের মহাসড়কে শুরু হয় দেশবাসীর অভিযাত্রা।

জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং বিশ্বসভায় বাংলাদেশকে স্ব-মর্যাদায় মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি শুরু হয় ইতিহাসের কালিমামোচন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অসমাপ্ত বিচারকাজ সম্পন্ন ও আদালতের রায় কার্যকর করা, মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ শুরু করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন ও বিচারকাজ শুরু করা, জাতীয় চারনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন, মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের স্বীকৃতি, সাংবিধানিকভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ করার মতো উল্লেখযোগ্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এ-সময়কালে বাস্তবায়ন করা হয়।

সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, উন্নয়নকে বাধাবিঘ্নহীন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ পরিচালনার পথ এবারেও মসৃণ ছিল না। পরাজিত শক্তি বিএনপি-জামাত জোট গণরায়কে মেনে নিতে না পেরে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে প্রথম থেকেই অগণতান্ত্রিক-অসাংবিধানিক নানা ষড়যন্ত্র ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড দ্বারা গণতন্ত্র ও উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। বিএনপি-জামাত জোট সংসদ বর্জন করে হরতাল ও অবরোধের মাধ্যমে অশান্তি, অরাজকতা ও

নৈরাজ্য সৃষ্টির সর্বাত্মক অপপ্রয়াস চালায়। আগুন সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য চালিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং প্রগতির চাকাকে উল্টে দিতে উদ্যত হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য পরাজিত দেশি ও আন্তর্জাতিক শক্তি মরিয়া হয়ে ওঠে। পরাজিত শক্তি সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। পাকিস্তানি গোয়েন্দার প্ররোচনায় বিএনপি-জামাত জোট মনে করতে থাকে যে, সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ আর টাকার খেলাই ক্ষমতার মসনদে যাওয়ার একমাত্র পথ। এসব প্রতিকূলতা প্রতিহত করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সামাজিক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় এবং পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকে দেশের অগ্রগতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও জামাতসহ স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তির জাতিবিরোধী সন্ত্রাসী চরিত্র দেশবাসীর সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাতের জন্য বিএনপি-জামাতসহ স্বাধীনতাবিরোধী উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে হত্যা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টিতে লিপ্ত হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ সাধারণ নাগরিকদের হত্যা ও '৭১-এর মতোই যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষায় জামাত-শিবিরের ঘাতকবাহিনী বিএনপিকে নিয়ে দেশবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাধারণ প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দিয়ে সরকার পতনের এ ষড়যন্ত্র ও অপপ্রয়াস ব্যর্থ করে দেশ ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করেন।

জনগণের পবিত্র আমানত ভোটের অধিকার সুরক্ষার জন্য নির্বাচনকালীন সরকারের প্রশ্নে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে টেলিফোনে সংলাপের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সংলাপের আহ্বান অসৌজন্যমূলকভাবে প্রত্যাখ্যান করে সংঘাত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার উৎখাতে বিএনপি-জামাত জোট নেত্রী খালেদা জিয়া মরিয়া হয়ে ওঠেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্বাচনকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সর্বদলীয় সরকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লাগাতার হরতাল, অবরোধ ও আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের ঘোষণা দেয়। দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে অবৈধ শক্তিকে ক্ষমতায় আনার সর্বাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ ও অপচেষ্টা জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করেন এবং দল ও জনগণকে সাথে নিয়ে সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

২.৫ আওয়ামী লীগ শাসনামল (জানুয়ারি ২০১৪-ডিসেম্বর ২০১৮) : উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে বিশ্বের বিস্ময় বাংলাদেশ

বিএনপি-জামাতের অভাবনীয় ও নৃশংস তাণ্ডব মোকাবিলা করে নির্বাচন সম্পন্ন করা, সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখা, সংসদীয় কার্যক্রম চালু রাখা, নির্বাচনের পর জনগণের জানমাল ও জীবন-জীবিকা সুরক্ষা করতে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা দেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নতুন উদ্যমে নতুন সরকার উন্নয়ন কর্মসূচি ও জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করে। সন্ত্রাস দমনে সরকারের দৃঢ়তা দেশে-বিদেশে যেমন নন্দিত হয়, তেমনি কুচক্রীমহলের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়। উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার সাফল্যের প্রেক্ষাপটে অনুকূল পরিস্থিতিতে সরকারের

দ্বিতীয় বছর শুরু হলে জাতিবিরোধী সাম্প্রদায়িক পরাজিত শক্তি হিংসা ও ধ্বংসের অগণতান্ত্রিক, অসাংবিধানিক ভ্রান্ত পথ আবারও গ্রহণ করে। জানুয়ারি ২০১৫ থেকে একটানা ৯০ দিন বিএনপি-জামাত জোট হরতাল-অবরোধ ঘোষণা করে। পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য তা চলতে থাকে, যা বাস্তবে ছিল গৃহযুদ্ধ বাধানোরই নামান্তর। পৈশাচিকতা ও বর্বরতার মাত্রা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নাশকতাকেও হার মানায়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার দেশকে শান্ত, স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করে দেশ যখন নতুন আস্থা ও প্রত্যয়ে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হতে থাকে এবং জনমনে ব্যাপক উদ্দীপনা দেখা দেয়, ঠিক তখনই চিহ্নিত সেই মহল উগ্র-ধর্মান্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে পুনরায় উসকানি দিয়ে মাঠে নামায়। নিরীহ ও মুক্তমনা মানুষ, সংখ্যালঘু ও বিদেশি, মসজিদের ইমাম, হিন্দু পুরোহিত, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের হত্যা এবং বৌদ্ধ-হিন্দু মন্দির আক্রমণ করে। সবশেষে ঢাকায় গুলশানের হলি আর্টিজান ক্যাফে নামক রেস্তোরাঁয় আক্রমণ করে ১৭ জন বিদেশিসহ ২২ জন নিরীহ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়। জঘন্যতম এ হত্যাকাণ্ডে গোটা জাতি এমনকি বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী শোলাকিয়া ঈদগা ময়দানে ঈদের নামাজের সময় জঙ্গি আক্রমণের ঘৃণ্য পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। দুজন নিরীহ মানুষ এবং পুলিশ সদস্য এই আক্রমণে নিহত হন। দেশ আত্মঘাতী নতুন এক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান প্রত্যক্ষ করে।

এই পরিস্থিতিতে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। 'জেগে ওঠো বাংলাদেশ, রুখে দাঁড়াও জঙ্গিবাদ' আওয়ামী লীগের এই স্লোগানে সাড়া দিয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঘোষণা করে। সৃষ্টি হয় গণঐক্য। দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জঙ্গি দমনে সাফল্য অর্জন করতে থাকে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানেই জঙ্গি দমনে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' নীতি মানুষের ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে এবং দেশে স্বস্তির পরিবেশ ফিরে আসে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জঙ্গি দমনে বাংলাদেশের সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশের জঙ্গিবিরোধী ভাবমূর্তি নতুন এক উচ্চতায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অসহায় শরণার্থীদের স্থান দিতে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো যেখানে আজ মানবতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে, তখন বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে অবৈধ ও অন্যায়ভাবে বিতাড়িত রোহিঙ্গা অসহায় শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। সার্বিক এই সাফল্য জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অবস্থান, নীতি ও কৌশলের সাফল্যের পরিচয় বহন করে।

বিগত দুই মেয়াদে ১০ বছর আওয়ামী লীগ সরকার যেমন একদিকে জনগণের নিকট প্রদত্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিক প্রতিশ্রুতি রক্ষার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে; অন্যদিকে সংঘাত, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের উত্থান মোকাবিলায় সরকারের দৃঢ়তা ও সাফল্য জনমনে নতুন এক আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করে। সম্ভাবনার এ স্বর্ণদুয়ার উন্মোচনে আওয়ামী লীগ ও জননেত্রী শেখ হাসিনা হয়ে ওঠেন অতীতের ঐতিহ্য সুরক্ষা, বর্তমানের সফল পথচলা এবং ভবিষ্যতের সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার অকুতোভয় ও বিশ্বস্ত কাণ্ডারি।

৩. সরকার পরিচালনায় দুই মেয়াদে (২০০৯-১৮) সাফল্য ও অর্জন এবং আগামী পাঁচ বছরের (২০১৯-২৩) লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

৩.১ গণতন্ত্র, নির্বাচন ও কার্যকর সংসদ

গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার সাথে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের সবক্ষেত্রে উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতির রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সার্বিক মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ গত প্রায় সাত দশক যাবৎ বাঙালির গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই বারবার বাংলার জনগণ সামরিক ও স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়েছে। আজ বঙ্গবন্ধু-কন্যার নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে– এগিয়ে চলছে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ। গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা তাদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ও দীর্ঘস্থায়ী করতে নির্বাচনী-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল। বর্তমানে জাতীয় চার নীতির অন্যতম নীতি গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথকে ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের মাধ্যমে রোধ করার সাধ্য কারও নেই।

সাফল্য ও অর্জন

- বিগত ১০ বছরে জাতীয় সংসদই ছিল সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু।
- প্রয়োজনীয় নির্বাচনী আইন ও বিধিমালা এবং যথাযথ বাজেট বরাদ্দ ও জনবল নিয়ে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে।
- সংবিধান ও আইন অনুযায়ী এবং বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সকল দল ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মতামতের ভিত্তিতে সার্চ কমিটি দ্বারা স্বচ্ছ ও স্বাধীন প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে।
- আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ কিংবা জন্মস্থানভিত্তিক সকল বৈষম্য নিরসনে কাজ করছে। রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার বন্ধ করা, বিদ্বেষ দূরীকরণ, তৃতীয় লিঙ্গসহ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, নাগরিক অধিকার ও সুবিধা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কর্মতৎপরতা চলছে।
- তথ্য অধিকার আইন, স্বাধীন তথ্য কমিশন, ৪৪টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল, অসংখ্য কমিউনিটি রেডিও, অনলাইন নিউজ পোর্টালসহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, দেশব্যাপী ইন্টারনেট সুবিধা আজ অবাধ তথ্যপ্রবাহ সৃষ্টি করে মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করেছে, যা অভূতপূর্ব।
- জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, চাহিদা প্রকাশ ও প্রাপ্তি এবং এর সুরক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে।
- সংবিধান অনুযায়ী মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বাধীন গণমাধ্যম, স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

- সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে স্থায়ী কমিটিসমূহের সক্রিয় দায়িত্ব পালন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের প্রশ্নোত্তর পর্বে নিয়মিত অংশগ্রহণ, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সংসদে প্রাণবন্ত আলোচনা, সরকার ও বিরোধী দলের সংসদে গঠনমূলক দায়িত্ব পালন, অশ্লীল ও অগ্রহণযোগ্য এবং অসংসদীয় আচরণ থেকে সংসদকে মুক্ত রাখা হয়েছে।
- দশম জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের সকল জাতীয় ও স্থানীয় সংসদের স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (সিপিএ)-এর চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন এবং দশম জাতীয় সংসদের অন্যতম সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী বিশ্বের সকল সংসদের স্পিকার ও সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের (আইপিইউ) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের দশম সংসদ ও শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি গণতান্ত্রিক বিশ্বের অবিচল আস্থার এ এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।
- সকল ধরনের ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং সকল দলের অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হবে এবং সংবিধান হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সর্বোচ্চ দলিল।**

৩.২ আইনের শাসন ও মানবাধিকার সুরক্ষা

আইনের শাসনের মূল বক্তব্যই হচ্ছে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান; কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এই নীতির আরেকটি অর্থ হচ্ছে− কেবলমাত্র সংবিধান ও নির্বাচিত সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনসমূহের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে একটা দীর্ঘ সময় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সংবিধান লঙ্ঘন করে দেশ পরিচালিত হওয়ায় আইনের শাসন ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশে আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। এ যাবত তিন মেয়াদে সরকারে এসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে।

সাফল্য ও অর্জন

- দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সাংবিধানিক সুরক্ষাকরণের বিশেষ বিধান (Constitutional Entrenchment) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(ক) ও ৭(খ), অনুচ্ছেদ ১৫০ ও চতুর্থ তফসিলের বিধান অনুযায়ী বর্তমানে সংবিধানের বাইরে বা সংবিধান পরিপন্থী কোনো অবৈধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরবর্তীতে সেটিকে বৈধতা দেওয়ার কোনো আইনি সুযোগ নেই।

- বিচার বিভাগের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিচারক নিয়োগের পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, বিচারকদের জন্য যৌক্তিক বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ, তৃণমূল মানুষের বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠা, বিরোধ নিরসনে বিকল্প পদ্ধতির (এডিআর) ব্যবহার, আইনি সহায়তার জন্য জেলায় জেলায় লিগ্যাল এইড প্রতিষ্ঠা, বিচারকদের উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করার মধ্যদিয়ে বিচার বিভাগের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলছে।
- অবৈধ ক্ষমতা দখলদারেরা আইনের শাসনের পথ রুদ্ধ করে দিতে হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দিয়েছে, এমনকি পুরস্কৃতও করেছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দায়মুক্তির এ অপসংস্কৃতি রোধ করেছে।
- বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার, বিডিআর হত্যাকাণ্ডের বিচার এবং দণ্ডিত যারা আটক ছিলেন তাদের বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। পলাতক আসামিদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **প্রত্যেক নাগরিকের আইনের আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা লাভের সুযোগ-সুবিধা অবারিত করা হবে।**
- **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণ ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা হবে।**
- **সার্বজনীন মানবাধিকার সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে কোনো প্রচেষ্টা প্রতিহত করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে। মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা এবং কার্যকারিতা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।**

৩.৩ দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসন

মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১-এর উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে একটি দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক সেবামুখী প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের বিকল্প নেই। সরকারের প্রচেষ্টা, তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতা এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের ফলে সরকারি দপ্তরে কাজের দক্ষতা ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অহেতুক কালক্ষেপণ এবং কাজের জটিলতা হ্রাসে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই ধারাকে অগ্রসর করে নিতে হবে।

সাফল্য ও অর্জন

- ইতোমধ্যে প্রশাসনের সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্স চালুর উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা হয়েছে।
- সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘তথ্য অধিকার আইন-২০০৯’ কার্যকর করা হয়েছে।

- প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির মাপকাঠি শুধু জ্যেষ্ঠতা নয়; যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ এবং জনগণ ও সংবিধানের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এজন্য জনপ্রশাসন সংস্কারসহ প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হচ্ছে।
- সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উন্নত কাজের পরিবেশ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সৎভাবে সম্মানজনক জীবন ধারণের জন্য মূল্যস্ফীতির নিরিখে বেতন-ভাতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ১০ বছরের মধ্যে ২০০৯ ও ২০১৫ সালে দুবার প্রায় সাড়ে তিন গুণ (৩৪৪ শতাংশ পর্যন্ত) বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- সরকারি কর্মচারীরা ব্যাংক থেকে ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত গৃহ নির্মাণ ঋণ নিতে পারবেন; পাঁচ ধাপে এই পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে (৩০ জুলাই ২০১৮ প্রজ্ঞাপন)।
- উপসচিব পদমর্যাদা পর্যন্ত সামরিক ও অসামরিক সকল কর্মচারী গাড়ি কেনার জন্য ৩০ লাখ টাকা সুদবিহীন ঋণ পাবেন এবং পরিচালনা বাবদ পাবেন মাসিক ৫০ হাজার টাকা।
- শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী প্রজাতন্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মাসিক পেনশন পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। যারা এককালীন পেনশনের অর্থ উত্তোলন করেছেন, তাদের ১৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর পেনশন সুবিধা পুনঃস্থাপনের আদেশ জারি করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাদের পরিবার এই সুবিধার আওতায় আসবে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **একটি আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর, দক্ষ দুর্নীতিমুক্ত দেশপ্রেমিক গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ অব্যাহত থাকবে।**
- **নিশ্চিত করা হবে প্রশাসনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সেবাপরায়ণতা। প্রশাসনের দায়িত্ব হবে নির্ধারিত নীতিমালা ও নির্বাহী নির্দেশাবলি বাস্তবায়ন।**
- **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানোর কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নানা স্তর কঠোরভাবে সংকুচিত করা হবে।**
- **নিয়মানুবর্তী এবং জনগণের সেবক হিসেবে প্রশাসনকে গড়ে তোলার কাজ অগ্রসর করে নেওয়া হবে।**

৩.৪ জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলা

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে পূর্বে জনমনে এক ধরনের ভীতি বিরাজ করত। সেটা দূর করে একটি জনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে আওয়ামী লীগ সরকার। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন-জীবিকা সুরক্ষার পূর্বশর্ত হলো– স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এরই ধারাবাহিকতায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

সাফল্য ও অর্জন

- ২০০৯ সালের জনসংখ্যার সাথে পুলিশের অনুপাত ১:১৩৫৫ হতে বর্তমানে ১:৮০১-এ দাঁড়িয়েছে।

- পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ট্যুরিস্ট পুলিশ, নৌ পুলিশ, স্পেশাল সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, রংপুর রেঞ্জ, রংপুর আরআরএফ, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, দুটি র‍্যাব ব্যাটালিয়ন, সাইবার পুলিশ এবং গাজীপুর ও রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ, এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) এবং কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)-সহ বিভিন্ন বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করা হয়। এতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গার্মেন্ট সেক্টরে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।

- পুলিশ ইন্সপেক্টরদের জন্য বিশেষ ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে। তারা বছরে একবার এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ ভাতা পাচ্ছেন। কারারক্ষী, কোস্টগার্ড এবং আনসার-এর দশম গ্রেড ও নিম্নপদের কর্মচারীদের ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

- বিগত ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর হতে দেশে উগ্র এবং জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সরকারের দৃঢ় অবস্থানের ফলে জঙ্গি অপতৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

- সুন্দরবনের দস্যুবাহিনীসমূহের আত্মসমর্পণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ও উপকূলীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা ও শান্তিশৃঙ্খলার উন্নয়ন সরকারের এক যুগান্তকারী মাইলফলক। সুন্দরবনকে জলদস্যুমুক্ত করা হয়েছে।

- মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে এবং বহু সংখ্যক মাদক ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

- পুলিশকে জনবান্ধব করার লক্ষ্যে যে কোনো প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তার জন্য '৯৯৯' সেবা চালু করা হয়েছে।

- পুলিশ সদস্যদের কল্যাণের জন্য 'পুলিশ কল্যাণ ট্রাস্ট' ও 'কমিউনিটি ব্যাংক' গঠন করা হয়েছে।

- আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মাসিক ভাতা প্রবর্তন করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **আগামী পাঁচ বছরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কারের কাজ আগামীতে অব্যাহত থাকবে।**

- **পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার কাজ চলমান থাকবে। সেবা প্রদানের জন্য দ্রুত সাড়াদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যানবাহন-**

সরঞ্জামাদি সরবরাহ, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ দমনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রয়োজনীয় ভূমি ও অবকাঠামোর সংস্থান, প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সদস্যদের কল্যাণমূলক কার্যের পরিধি বিস্তারে কৌশলগত পরিকল্পনার আলোকে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

৩.৫ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ

দুর্নীতি একটি বহুমাত্রিক ব্যাধি। পেশিশক্তির ব্যবহার ও অপরাধের শিকড় হচ্ছে দুর্নীতি। যার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে অবক্ষয় বা পচন শুরু হয় এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন প্রভৃতি কোনো ক্ষেত্রেই ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয় না। দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও আইনের প্রয়োগ মুখ্য হলেও তা শুধু সরকারের দায় নয়, জনগণেরও দায় রয়েছে। আমরা মনে করি, দুর্নীতি দমনে প্রয়োজন সরকার ও জনগণের সমন্বিত পদক্ষেপ।

সাফল্য ও অর্জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন। ফলে জনগণ এর সুফল ভোগ করছে।
- দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কার্যপরিচালনা করার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ জনগণ যাতে সহজে দাখিল করতে পারে, সেজন্য দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে 'অভিযোগ গ্রহণ বাক্স' স্থাপন করা হয়েছে।
- দুর্নীতি দমন কমিশন চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট বাজেট বরাদ্দ চেয়ে থাকে এবং কমিশনের চাহিদা মোতাবেক সরকার বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে আসছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **দুর্নীতি দমন কমিশনকে কর্ম পরিবেশ ও দক্ষতার দিক থেকে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে। সেক্ষেত্রে দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতায় এবং প্রায়োগিক ব্যবহারে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।**
- **বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও তদারকি ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে।**
- **দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ জোরদার করা হবে।**
- **ঘুষ, অনোপার্জিত আয়, কালো টাকা, চাঁদাবাজি, ঋণখেলাপি, টেন্ডারবাজি ও পেশিশক্তি প্রতিরোধ এবং দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়ন নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

৩.৬ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মাদক নির্মূল

সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক মানবতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও প্রগতির পথে অন্তরায়। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি পূর্বাপর পরাজয়ের প্রতিশোধ ও ক্ষমতা দখল করতে সন্ত্রাস-সহিংসতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বিএনপি-জামাত জোট আমলে 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' হিসেবে আমরা নিন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু দেশ এখন জঙ্গিবাদ দমনে বিশ্বসমাজে প্রশংসিত।

সাফল্য ও অর্জন

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রম বিশ্বসম্প্রদায়ের কাছে বিশেষভাবে জাতিসংঘের ৭১তম অধিবেশনে প্রশংসিত হয়েছে।
- উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং জঙ্গিবাদের হাত থেকে দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ সম্পন্ন ও তা বানচালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল অপচেষ্টা প্রতিহত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার।
- অবৈধ অস্ত্র আমদানি, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান, বেচাকেনা ও ব্যবহার কঠোর হস্তে দমন করা হচ্ছে।
- দেশব্যাপী জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও মাদক রোধকল্পে সাম্প্রদায়িকতা ও মাদকবিরোধী প্রতিবাদ, তৎপরতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **আগামীতে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি সরকারের দৃঢ় অবস্থান থাকবে।**
- **সন্ত্রাসী-গডফাদারদের এবং তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।**
- **সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা হবে।**
- **মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ও চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।**
- **আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।**

৩.৭ স্থানীয় সরকার : জনগণের ক্ষমতায়ন

তৃণমূলের জনসাধারণের নানামুখী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কার্যকর স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দারিদ্র্য নিরসন ও বৈষম্য হ্রাস করে উন্নয়ন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দরকার

স্বায়ত্তশাসিত কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার। ইতোমধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদসহ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে শক্তিশালী করা হয়েছে, দেওয়া হয়েছে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব। এই প্রক্রিয়াকে অগ্রসর করে নিতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সাফল্য ও অর্জন

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- নির্বাচিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়নের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার সমুন্নত রাখা হয়েছে।
- সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যাতায়াতসহ অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা উন্নত ও প্রসারিত করার জন্য সরকারের সাহায্য ও উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। শহরভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন দৃষ্টিনন্দন হাতিরঝিল ঢাকা শহরের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে এবং চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সরাসরি সম্পৃক্ত করার জন্য লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)-এর কার্যক্রম দেশের মোট ৪ হাজার ৫৭০টি ইউনিয়ন পরিষদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন, প্রত্যেক অফিসেই ইনোভেশন টিম গঠন, ই-ফাইল সিস্টেম, ই-মোবাইল কোর্ট সিস্টেম, ই-সার্ভিস রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং জেলা-ব্র্যান্ডিং কৌশল-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সরকারের ২৫ হাজার তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায়ের অভিযোগ সরাসরি নিস্পত্তির লক্ষ্যে নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানির ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থানকে বিবেচনায় নিয়ে জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন করা হবে। বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় সরকারের জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হবে।**
- **জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজন সুনির্দিষ্ট করা হবে।**
- **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযোগী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।**

- **নগর ও শহরে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, পরিকল্পিত উন্নয়ন এবং নগর ব্যবস্থাপনায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।**

৩.৮ সামষ্টিক অর্থনীতি : উচ্চ আয়, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

২০০৭-০৮ সালে বৈশ্বিক মন্দা, অর্থনৈতিক শ্লথ ও সংকট পরবর্তী একটি কঠিন সময়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। বিগত সময়ে বিএনপি-জামাত জোটের দুঃশাসন এবং ১/১১ সরকারের জোরজবরদস্তি ও অবিমৃশ্যকারী পদক্ষেপের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব এবং দুই মেয়াদে ১০ বছর বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে বর্তমানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সাফল্য ও অর্জন, তা দেশের ইতিহাসে অনন্য এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে অনুকরণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে এই ধারাকে অগ্রসর করে নেওয়াই আগামী দিনগুলোর চ্যালেঞ্জ।

সাফল্য ও অর্জন

- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৮৬ শতাংশ হারে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। সাম্প্রতিক প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বহার হতে ধারণা করা যায়, ২০২৫-৩০ সালে প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।
- ক্রয়ক্ষমতার সমতার জিডিপির ভিত্তিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশ আজ ৩৩তম স্থান অধিকার করেছে।
- মাথাপিছু আয় বর্তমানে উন্নীত হয়েছে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে, যা ২০০৬ সালে ছিল ৪২৭ ডলার।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপি হয়েছে ২২ লাখ কোটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তুলনায় এখন প্রায় পাঁচ গুণ।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাজেটের আকার ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭১ কোটি টাকা, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৬১ হাজার ৫৮ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উন্নয়ন বাজেট প্রাক্কলিত হয়েছে ১ লাখ ৭৩ হাজার কোটি টাকা, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা।
- বাজেট ঘাটতি আশানুরূপভাবে জিডিপির ৫ শতাংশে সীমিত রাখা হয়েছে গত ১০ বছর।
- অতীতের তুলনায় বিনিয়োগ বেড়েছে, বর্তমানে প্রায় ৬ লাখ ৬০ হাজার কোটি টাকা। এটা জিডিপি-র ৩১.০ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ২৫.৮ শতাংশ। সরকারি বিনিয়োগ বেড়ে হয়েছে জিডিপি-র ৭.৬ শতাংশ, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ৪.১৩ শতাংশ।
- রপ্তানি আয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সাড়ে তিন গুণ বেড়ে হয়েছে ৩৬.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ছিল ১০.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন প্রায় ৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা সাত মাসের বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটাতে সক্ষম।
- রাজস্ব সংগ্রহের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা হয়েছে, যার ফলে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে ক্রমবর্ধমান বাজেট বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হচ্ছে। মোট রাজস্ব আয় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ লাখ ৫৯ হাজার ৪৫৪ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ছিল ৪৪.২ হাজার কোটি টাকা।
- চলতি অর্থবছরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ৫.৪৩ শতাংশের নিচে নেমে আসে। খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.১ শতাংশ, যা সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাসের প্রধান কারণ।
- আয়বর্ধক কর্মসৃজন, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ, নতুন বেতন স্কেল ও মহার্ঘ ভাতা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে মানুষের প্রকৃত আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০০৯-১৮ সময়কালে বেতন ৩৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ শতকরা ১২৩ হারে বেতন বৃদ্ধি পেলেও মুদ্রাস্ফীতির ওপর কোনো প্রভাব ফেলেনি।
- সার্বিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অব্যাহত উচ্চহারে প্রবৃদ্ধির স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মূল্যায়নে ২০১৬ সালে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে এবং ২০১৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক নিম্ন আয়ের দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস (২০১৫-৩০) এবং ঋণাত্মক (২০২৫-৩০) হওয়ার ফলে সার্বিক জাতীয় আয়ের তুলনায় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার হবে উচ্চতর।

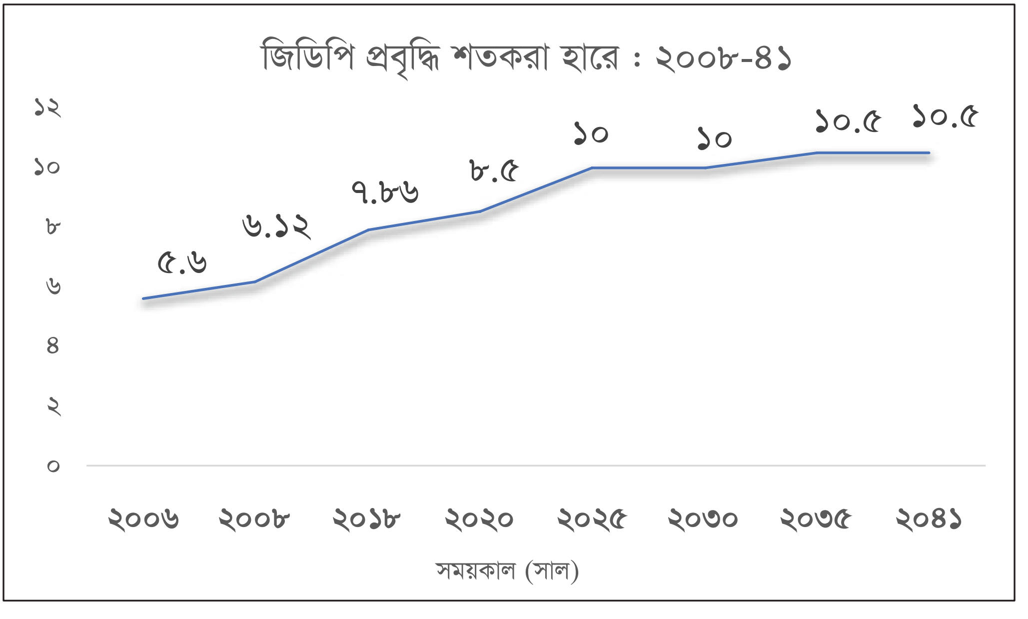

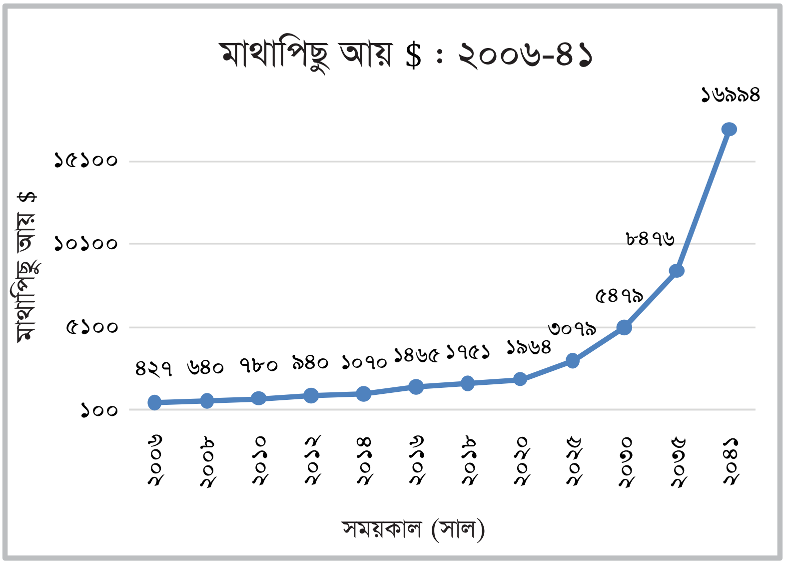

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা : স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ থেকে স্বাধীনতার ৭০ বছর ২০৪১

বিগত ১০ বছরে আওয়ামী লীগ শাসনামলে উন্নয়নের সূচকগুলোর বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং আপামর মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নতি গণমনে আত্মবিশ্বাস ও সাহস এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রূপান্তর সম্ভব। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর লক্ষ্য অর্জন করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাধীনতার ৭০ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে অগ্রসর হতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

- এই পরিকল্পনায় অঙ্গীকার অনুয়ায়ী ২০১৯-২৩ সময়কালের লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচির সাথে সাথে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রাকে এমনভাবে সমন্বয় করা হবে, যাতে দেশ ধারাবাহিকভাবে সুদূরপ্রসারি লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ২০২১ পালনকালে হবে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে।
- এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় হবে ৫ হাজার ৪৭৯ ডলারেরও বেশি।
- এই পরিকল্পনায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের হার শূন্য শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।
- ২০২১ থেকে ২০৪১, অর্থাৎ ২০ বছর বাংলাদেশকে প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় হার ১০ শতাংশ ধরে রাখতে হবে। গত অর্থবছরে ৭.৮৬ শতাংশের প্রবৃদ্ধির হার প্রমাণ করে, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে ভিত্তি বছর (২০০৫-০৬) পরবর্তী অর্জন এবং আগামী মেয়াদে (২০১৮-২৩) লক্ষ্যমাত্রা

শিরোনাম	২০০৫-০৬ বিএনপি-জামাত	২০১৭-১৮ আওয়ামী লীগ	২০২৩-২৪ লক্ষ্যমাত্রা
জিডিপি প্রবৃদ্ধি	৫.৪০	৭.৮৬	১০.০০
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারে)	৪২৭.০০	১৭৫১.০০	২৭৫০.০০
জাতীয় সঞ্চয় (জিডিপির শতাংশে)	২৭.৭০	২৯.০০	৩৭.০০
বিনিয়োগ (জিডিপির শতাংশে)	২৪.৭০	৩০.৫০	৩৭.০০
বাজেট (কোটি টাকায়)	৬৪,৩৮৩.০০	৪,০০২৬৬.০০*	১০,০০,০০০.০০
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	৩.৮৮	৩৪.০০	৫০.০০
রপ্তানি আয় (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১০.০৫	৩৬.৬০	৭২.০০
আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	১৪.৭০	৫৬.০০	১১০.০০
দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	৪১.৫১	২১.৫০	১২.৩০
অতি দরিদ্র জনসংখ্যা (শতকরা হারে)	২৫.১০	১১.৩০	৪.৫০
বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা (মেগাওয়াটে)	৩,৭৮২.০০	২০,৪০০.০০	২৮,০০০.০০

** উল্লেখ্য যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট হয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা।*

৩.৮.১ কৌশল ও পদক্ষেপ

বেসরকারি খাতে নতুন মূলধন সৃষ্টির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে

- ২০৪১ সালের মধ্যে বিনিয়োগের হার জিডিপি-র ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামো সেবা সরবরাহ করতে হবে।
- রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- ব্যাংক ও বীমা খাতের সেবা সম্প্রসারণ, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।
- পুঁজিবাজারের সম্প্রসারণ ও গভীরতা এবং পুঁজিপণ্য সরবরাহ ও বৈচিত্র্য বাড়াতে হবে। ইতোমধ্যে চীনা কনসোর্টিয়াম ঢাকা পুঁজিবাজারে কৌশলগত বিনিয়োগ করেছে।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হবে।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি মূলধনী কোম্পানির শেয়ার এবং ভেঞ্চার ক্যাপিটালে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের লেনদেন দ্রুত নিষ্পন্ন করা হবে।
- দেশব্যাপী বিনিয়োগ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা হবে।

জনসংখ্যায় বয়স কাঠামোর সুবিধাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে

- ২০১৫ সালে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর অনুপাত ছিল ৬৬ শতাংশ, ২০৩০ সালে যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৭০ শতাংশ। ২০৩০-এর পর থেকে এই হার কমতে থাকবে। এই জনমিতিক সম্ভাবনার সুফল বাস্তবায়নের জন্য সকল পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- শোভন কাজের পরিসর বৃদ্ধি করা হবে, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও নতুন প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বারোপ করা হবে, ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরের সুযোগ তৈরি করা হবে।
- কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ১১৯ উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, অতিরিক্ত ৩৮৯টি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্থাপন করা হবে।
- শুধু ভৌত উপকরণের ওপর নির্ভর করে অব্যাহত প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয়। শিল্পনির্ভর প্রবৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে

- রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং নতুন বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সীমিত সংখ্যক পণ্য ও বাজারের ওপর নির্ভর করে রপ্তানি সম্প্রসারণ দুঃসাধ্য। রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য খাতভিত্তিক সমস্যাবলি সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সরকার যে সকল সহায়তা দেয়, যথা– শুল্ক-কর-মুসক রেয়াৎ, নগদ প্রণোদনা ইত্যাদির সামগ্রিক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন অনুসারে সংস্কার ও সমন্বয় করা হবে। জ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্প বিকাশের জন্য শুল্ক-কর সুবিধা ও প্রণোদনা বিশেষ বিবেচনা পাবে, যা প্রশিক্ষিত তরুণ ও যুবকদের শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং দক্ষ উদ্যোক্তা-শ্রেণি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে।

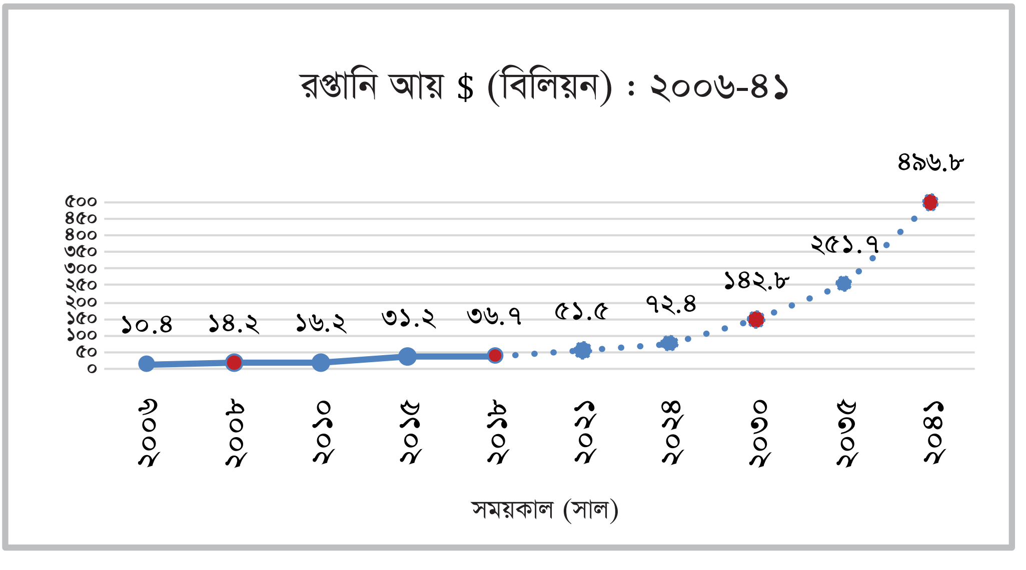

প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে

- ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০) কালপর্বে গড় প্রবৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২৫) কালপর্বে এই হার গড়ে ১০.০ শতাংশ ছুঁয়ে যাবে।

কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে

- আয়কর, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানো হবে।
- মূসক আইন যুক্তিযুক্ত ও বাস্তবায়নযোগ্য করে বিদ্যমান ইস্যুগুলোকে সমাধান করা হবে। ভ্রান্ত পৌনঃপুনিক কর আরোপ (কাসকেডিং) পরিহার করা হবে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বিরোধ নিষ্পত্তির সাফল্য বিবেচনায় নিয়ে কর কর্মকর্তাদের পুরস্কার বা প্রণোদনা প্রদান কার্যক্রমকে অধিক কার্যকর করা হবে।
- আয়ের সাথে সংগতি রেখে আয়করের পরিধি ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে।
- কর কর্মকর্তাদের ব্যবসায়িক অর্থায়ন, হিসাববিজ্ঞান, বাণিজ্যিক আইন, ব্যাংকিং আইন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বাজেট প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সংস্কার করার লক্ষ্যে

- বিনিয়োগ ও কল্যাণমুখী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দক্ষতা প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ভাতা প্রদান করা হবে।
- সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনীর জন্য প্রয়োজন অনুসারে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে, যার মধ্যে বয়স্ক পুরুষ জনগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত হবেন। দুস্থ, বিধবা ও বয়স্ক নারীদের জন্য বিদ্যমান কর্মসূচির আওতা ও ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) দ্বিগুণ করার জন্য অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ৯ শতাংশ এডিপি-তে খরচ করার উদ্দেশ্যে বাজেট কৌশলে সমন্বয় করা হবে। বিদেশি অর্থায়নের কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। ব্যাংক হতে ঘাটতি অর্থসংস্থান নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে।
- একটি শক্তিশালী বেসরকারি খাত যাতে অধিক রাজস্ব প্রদান করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সে-লক্ষ্য সামনে রেখে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।
- বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সমন্বিত করে পিপিপি ও বিডা-র প্রধান নির্বাহী নিয়োগ করা হবে, যা প্রতিষ্ঠান দুটির কর্মদক্ষতা বাড়াবে। বিশেষজ্ঞ ও প্রশাসনিক প্রধান ও সর্বোচ্চ অনুমোদন ক্ষমতা দুটির মধ্যে আমলাতান্ত্রিক স্তর কমিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হবে।
- ব্যবসার পরিচালনা ব্যয় (Cost for doing Business) ক্রম-উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে

- বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালী করা হবে।
- ঋণসহ ব্যাংক জালিয়াতি কঠোর হস্তে দমন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী, ঋণ গ্রাহক ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।
- খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার এবং দেউলিয়া আইন বাস্তবায়নের টেকসই ও কার্যকর পদ্ধতি নির্ণয় করা হবে। বাজার-ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিচক্ষণতার সাথে নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করে সুদের হার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। ঋণ অনুমোদন ও অর্থ ছাড়ে দক্ষতা এবং গ্রাহকের প্রতি ব্যাংকের দায়বদ্ধতা পরিবীক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক পদক্ষেপ নেবে।

অর্থপাচার রোধ করার লক্ষ্যে

- বিদেশে অর্থ বা পুঁজিপাচার ও সম্পদ গচ্ছিত রাখা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং অপরাধ দৃঢ়ভাবে দমনে সক্রিয় থাকছে। পুঁজিপাচার ও সন্ত্রাসী অর্থসংস্থান দমনের ক্ষেত্রে বিশ্ব সংস্থা এগমন্ট গ্রুপের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ গ্রুপের ১৫৯টি সদস্য রাষ্ট্র এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে মানি-লন্ডারিং ও সন্ত্রাস সমর্থনে অর্থসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান এবং অপরাধ নিরোধ কার্যক্রম সমন্বয় করে। অর্থপাচার ও জঙ্গি সহায়তায় অর্থসংস্থান দমনের জন্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে বিশ্বসংস্থা ও বিদেশি সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ রাখছে। অর্থপাচার রোধ এবং পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য 'বিদেশে পাচারকৃত সম্পদ ফেরত আনার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স' কাজ করছে।
- মানি-লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র ২০১৫-১৭ সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনের আবশ্যিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরাধ ও শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে অর্জিত সম্পদ পাচার রোধ এবং পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার কৌশলের ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থপাচার রোধে সকল কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৩.৯ অবকাঠামো উন্নয়নে বৃহৎ প্রকল্প (মেগা প্রজেক্ট)

দেশের উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চারের জন্য বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রকল্পের প্রয়োজন অপরিহার্য। মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের ফলে অবকাঠামো খাতে বাধা দূর এবং সার্বিক অর্থনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মেগা প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে– পদ্মাসেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, গভীর সমুদ্রবন্দর, ঢাকায় দ্রুত গণপরিবহনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ, এলএনজি ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট, মহেষখালী-মাতারবাড়ী সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম, পায়রা সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু রেল সংযোগ এবং চট্টগ্রাম হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ১২৯.৫ কিলোমিটার

রেললাইন স্থাপন। আওয়ামী লীগ এসব মেগা প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও ভূমিকা পালনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসব মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে এবং সেই সাথে মানুষের কর্মসংস্থান, আয় ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে বহুগুণ।

সাফল্য ও অর্জন

- প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য ৮টি বৃহৎ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- গণবিরোধী শক্তির শত বাধা-বিপত্তি শক্ত হাতে মোকাবিলা করে নিজস্ব অর্থায়নে বহু প্রত্যাশিত পদ্মাসেতুর কাজ ২০১৮ সালের প্রথমার্ধেই ৬২ শতাংশ সমাপ্ত হয়েছে।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।
- মেট্রোরেল স্থাপনের কাজ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ডিসেম্বর ২০১৯ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ডিসেম্বর ২০২০ সালে শেষ হবে।
- চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দরের ওপর নির্ভরতা কমানোর জন্য পটুয়াখালীর পায়রাতে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পায়রা বন্দরের পরিপূর্ণ উন্নয়নের জন্য ১৯ প্রকার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এই বন্দরের মাধ্যমে ২০১৬ সালে প্রাথমিকভাবে মালামাল উঠানো-নামানো শুরু হয়েছে।
- সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর, রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এলএনজি টার্মিনাল বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে জাতীয় গ্রিডে এলএনজি গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **অবকাঠামো রূপান্তরের লক্ষ্যে বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হবে।**
- **পদ্মা রেলসেতু সংযোগ এবং কক্সবাজার-দোহাজারী-রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে।**
- **মাতারবাড়ী কয়লা বন্দর, ভোলা গ্যাস পাইপ লাইন ও উপকূলীয় অঞ্চলে একটি পেট্রোকেমিক্যালস কারখানা স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।**

৩.১০ 'আমার গ্রাম – আমার শহর' : প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ

গ্রামকে আওয়ামী লীগ উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রীয় দর্শন হিসেবে বরাবরই বিবেচনা করে এসেছে। স্বাধীন দেশে জাতির পিতা সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে নগর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার

উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার যুক্ত করেছিলেন। বর্তমান সরকার প্রতিটি গ্রামকে শহরে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

সাফল্য ও অর্জন

- বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে বহুমাত্রিক তৎপরতা যেমন– শিক্ষা সম্প্রসারণ, কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষ জনবল বাড়াতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ, গ্রামাঞ্চলে আর্থিক সেবা খাতের পরিধি বিস্তার, কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, বিদ্যুতায়ন, গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি গ্রামোন্নয়ন প্রয়াসকে ত্বরান্বিত করেছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি গ্রামীণ অর্থনীতির এই বিকাশ প্রক্রিয়ায় সহায়ক হচ্ছে।
- গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য এসেছে। কৃষিজ ও অকৃষিজ উভয় ক্ষেত্রে কর্মকাণ্ড বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমান সরকার কৃষিক্ষেত্রে অসামান্য গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি অকৃষি খাত যেমন– গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রামীণ পরিবহন ও যোগাযোগ এবং গ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে চলেছে। ফলে গ্রামীণ পরিবারের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে অকৃষি খাতের অবদান বেড়ে চলেছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **উন্নত রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, সুপেয় পানি, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও সুচিকিৎসা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, উন্নত পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, কম্পিউটার ও দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সুবিধা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধাদি দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
- **গ্রামে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ আরও বাড়ানো ও নির্ভরযোগ্য করার লক্ষ্যে গ্রুপভিত্তিতে বায়োগ্যাস প্লান্ট ও সৌরশক্তি প্যানেল বসানোর উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া হবে।**
- **গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র, ওয়ার্কশপ স্থাপন করে যন্ত্রপাতি মেরামতসহ গ্রামীণ যান্ত্রিকায়ন সেবা সম্প্রসারণ করা হবে এবং এসবের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান করা হবে। অকৃষি খাতের এসব সেবার পাশাপাশি হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাত করতে বেসরকারি খাতের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।**

৩.১১ তরুণ যুবসমাজ : 'তারুণ্যের শক্তি — বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'

যুবসমাজ দেশের মূল্যবান সম্পদ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ। 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রধানতম শক্তি

হচ্ছে যুবশক্তি। দেশের এই যুবগোষ্ঠীকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যুব উন্নয়নে আমাদের অগ্রাধিকার যুবদের মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও নাগরিক ক্ষমতায়ন এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত যুবসমাজ।

সাফল্য ও অর্জন

- বিগত ১০ বছর ধরে যুবদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ অবারিত করতে সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা, অনুদান ও কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যুবসমাজকে করে তোলা হচ্ছে শিক্ষিত, দক্ষ, কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল।
- বাংলাদেশের যুবসমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে প্রণয়ন করা হয়েছে যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি-২০১৭।
- ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২৪ লাখ তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে গত ১০ বছরে।
- যুব সংগঠনগুলোর কাজ অনুপ্রাণিত করতে ১,২১৯ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ অগ্রসর করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সাত পর্বে মোট ৩৭টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে ১ লাখ ৯৩ হাজার ৯৮৫ যুবককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৯১ হাজার ৬৫০ জন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। অস্থায়ী কর্মশেষে তাদের মধ্যে মোট ৮৩ হাজার ১৪ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

প্রশাসন, নীতি ও বাজেট প্রণয়ন

- **একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় যুবনীতি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।**
- **তরুণদের কল্যাণ ও উন্নয়ন কাজে প্রশাসনিক গতি আনতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় গঠন করা হবে পৃথক যুব বিভাগ।**
- **জাতীয় বাজেটে বাড়ানো হবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আর্থিক বরাদ্দ। জেন্ডার বাজেটের আলোকে প্রণয়ন করা হবে বার্ষিক যুব বাজেট।**
- **তরুণদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করার জন্য গঠন করা হবে যুব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'যুব গবেষণা কেন্দ্র'।**

শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি

- স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যুগোপযোগী করতে কারিগরি শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অগ্রাধিকার পাবে।
- তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলায় প্রসারিত করা হবে।
- সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর বিষয়ে মেধা ও দক্ষতা বিবেচনায় রেখে বাস্তবতার নিরীখে যুক্তিসংগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- প্রতিটি উপজেলায় 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি এই কেন্দ্রগুলোকে পর্যায়ক্রমে 'তরুণ কর্মসংস্থান কেন্দ্র' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।
- দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দুটি নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। 'কর্মঠ প্রকল্প'র অধীনে 'স্বল্প শিক্ষিত/স্বল্প দক্ষ/অদক্ষ' শ্রেণির তরুণদের শ্রমঘন, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উপযোগী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। 'সুদক্ষ প্রকল্প'র অধীনে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা ও জোগানের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে, তা দূর করতে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চ শিক্ষিত তরুণদের তথ্য সম্বলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন ও তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির জন্য আবেদন করার আহ্বান জানাতে পারবে।
- কর্মসংস্থানে কৃষি, শিল্প ও সেবার অংশ যথাক্রমে ৩০, ২৫ ও ৪৫ শতাংশে পরিবর্তন করা হবে। ২০২৩ সাল নাগাদ অতিরিক্ত ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে নতুনভাবে ১ কোটি ১০ লাখ ৯০ হাজার মানুষ শ্রমশক্তিতে যুক্ত হবে।

আত্মকর্মসংস্থান ও তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি

- তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা ও আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা জামানতে ও সহজ শর্তে জনপ্রতি ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা ইতোমধ্যে প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে এই সুবিধা আরও বিস্তৃত করা হবে।
- তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা সম্ভাবনার ছাপ রাখতে সক্ষম হবে তাদের জন্য আর্থিক, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা হবে।
- তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রণয়ন করা হবে একটি যুগোপযোগী 'তরুণ উদ্যোক্তা নীতি'।

বিনোদন, মানসিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি

- **তরুণদের সুস্থ বিনোদনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় গড়ে তোলা হবে একটি করে 'যুব বিনোদন কেন্দ্র' যেখানে থাকবে বিভিন্ন ইনডোর গেমসের সুবিধা, মিনি সিনেমা হল, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া সেন্টার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কর্নার, মিনি থিয়েটার ইত্যাদি।**
- **স্বল্প খরচে তরুণদের কাছে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দিতে 'ইয়ুথ প্ল্যান' চালু করা হবে।**
- **উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ও জঙ্গিবাদের প্রথম লক্ষ্য যুবসমাজকে আকৃষ্ট করা। এই যুবসমাজ যাতে আদর্শিক ভ্রান্তিতে মোহাবিষ্ট হয়ে জঙ্গি তৎপরতায় যুক্ত না হয়, সেজন্য কাউন্সিলিং এবং তাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশকে ত্বরান্বিত করা হবে।**
- **তরুণদের মাদকের ভয়াল আসক্তি থেকে মুক্ত করতে প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র করা ও বেসরকারি কেন্দ্রগুলোর জন্য সরকারি অনুদান বাড়ানো হবে।**
- **প্রতিটি জেলায় একটি করে 'যুব স্পোর্টস কমপ্লেক্স' গড়ে তোলা হবে।**

নাগরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

- **টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের যাত্রায় যুক্ত করা হবে তরুণদের। মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে আমলে নেওয়া হবে তরুণদের বক্তব্য। জাতীয় যুবনীতির বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণেও যুক্ত করা হবে সমাজের সকল স্তরের তরুণদের।**

৩.১২ নারীর ক্ষমতায়ন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংবিধানের ১০ ও ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ' এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। প্রসূতি মায়েদের জন্য ছয় মাসের ছুটি এবং পিতার সাথে মাতার নাম লেখার নীতি প্রভৃতি সব আওয়ামী লীগেরই অবদান। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মের সব পরিসরে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে।

সাফল্য ও অর্জন

- জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ-সহ সকল আন্তর্জাতিক সনদ অনুসরণে সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করেছে। রাজনীতিতে নারীর বর্ধিত অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ইউনিয়ন

কাউন্সিল ও উপজেলা পরিষদে এবং পৌরসভায় সংরক্ষিত নারীর আসন এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- পরিবারে নারীর সমতা বিধানের জন্য যৌতুক প্রতিরোধে 'যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য অবদানের জন্য জাতিসংঘ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এ 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' এবং 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কারে ভূষিত করেছে। সম্প্রতি গ্লোবাল উইমেনস সামিট-২০১৮-তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **২০২০ সাল নাগাদ উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষায় নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীর অনুপাত বর্তমানের ৭০ থেকে ১০০ শতাংশে বৃদ্ধি করা হবে। প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে নারীর অধিক সংখ্যায় নিয়োগের নীতি আরও বৃদ্ধি করা হবে।**
- **নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা, কারিগরি সুবিধা ও সুপারিশসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**
- **'জয়িতা' ফাউন্ডেশন সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারীদের সফল উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ সম্প্রসারণ করা হবে।**
- **নারীদের পুরুষের সমান মজুরির নিশ্চয়তা দেওয়া এবং গ্রামীণ নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সকল ক্ষেত্রে নারীদের কর্মপরিবেশ উন্নত করা হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।**
- **সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য চমৎকার 'ডে কেয়ার সেন্টার' গড়ে তোলা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হবে।**

৩.১৩ দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈষম্য হ্রাস

দারিদ্য বিমোচন

বিদেশি শাসন ও শোষণের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দারিদ্র্য একবিংশ শতকের উপযোগী আলোকোজ্জ্বল সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে অন্তরায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর সামরিক স্বৈরশাসনের আমলে 'মানি ইজ নো প্রবলেম' নীতি জাতির পিতার স্বপ্ন 'দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর' পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯৬-২০০১ আওয়ামী লীগ শাসনামলে জাতি দারিদ্র্য বিমোচনে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু আবারও পথভ্রষ্ট হয় জাতি। বিগত ১০ বছরে জাতি আজ অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। বর্তমানের সাফল্য ও অর্জনের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আগামী দিনগুলোতে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

অর্জন ও সাফল্য

- দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশের সাফল্য দেশীয় পরিমণ্ডলের বাইরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে।
- অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের হার ২১ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।
- সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য (ভিজিডি), চর জীবিকায়নসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৩০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৭৬ লাখ ৩২ হাজার ব্যক্তি বা পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- গ্রাম ও শহরের সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আবাসিক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গরিব, বঞ্চিত, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভাগীয় ও জেলা শহরে আবাসনসহ উপযুক্ত কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।
- তুলনামূলকভাবে অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকা (উত্তরাঞ্চল, উপকূলবর্তী এলাকা ও চরাঞ্চল, হাওড়, বাঁওড় প্রভৃতি)-সহ সারাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর গড়ে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে ৮ লাখ মানুষের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান করা হয়েছে।
- বর্তমানে একদিনের মজুরি দিয়ে একজন শ্রমিক প্রায় ৯-১০ কেজি চাল কিনতে পারছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে যা সর্বোচ্চ। অথচ ২০০৬-০৭ অর্থবছরে একদিনের মজুরি দিয়ে ক্রয় করা যেত মাত্র ৩.৫ কেজি চাল। চালের মূল্যের সাথে তুলনা করে দেখা যায়, সাত বছরে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি।
- দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও লক্ষ্যভিত্তিক ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তার খাতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা বর্তমান বাজেটের ১৩.২৮ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৩৪ শতাংশ। এই খাতে বরাদ্দ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা থেকে ৪.৬ গুণ বাড়িয়ে চলতি অর্থবছরে ৬৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় ৭৫ হাজার ৯৯৩টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করে ৩৬.৩৯ লাখ পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। ১ হাজার ৩৬৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা, ১ হাজার ১৫৫ কোটি ২১ লাখ টাকা কল্যাণ অনুদান (উৎসাহ বোনাস) ও ২ হাজার ২৮ কোটি ৯৮ লাখ টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান এবং সমিতিগুলো ২১৯ কোটি ৭৭ লাখ টাকা সেবামূল্য আদায় করেছে।
- ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ লাখ ৮২ হাজার ৩৯টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর আওতায় ১ লাখ ৫৮ হাজার ৫২৯টি পরিবারকে নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য ১ লাখ টাকা করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

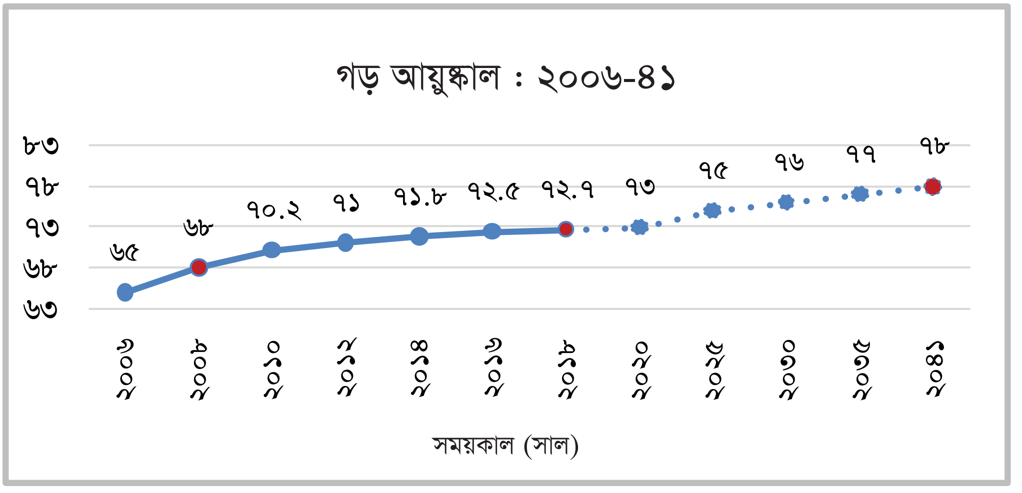

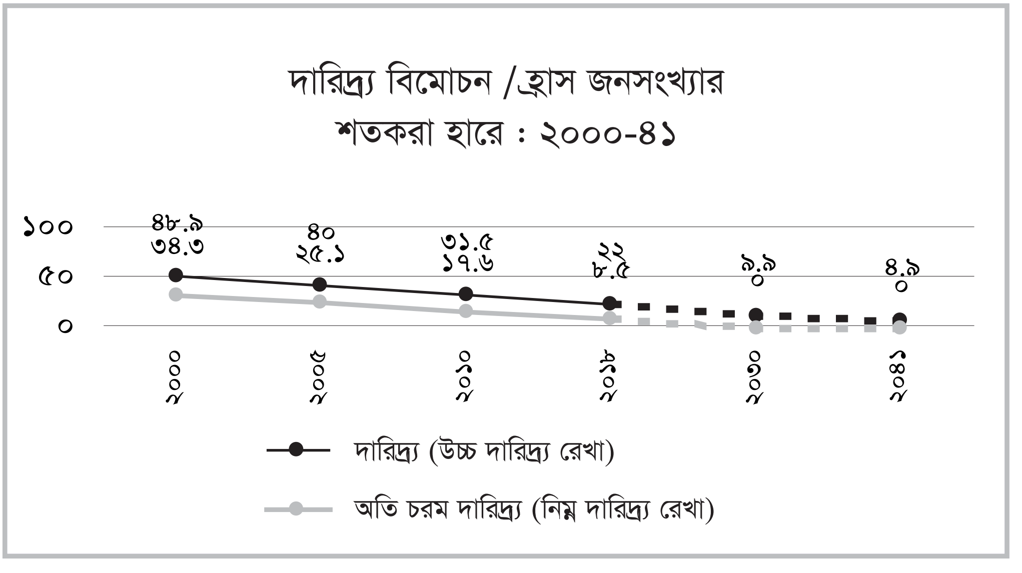

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- বর্তমানে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ৪ কোটি ৯২ লাখ লোক বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সহযোগিতা পাচ্ছে; আগামী পাঁচ বছরে এই খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হবে।
- দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরেপনা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা হবে। দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ১২.৩ ও ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে দরিদ্র জনসংখ্যা ২.২ কোটির নিচে নামানো হবে।

- **প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজনের নিয়মিত রোজগার নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য হাসিল করা হবে।**
- **পল্লি সঞ্চয় ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের মাধ্যমে পল্লি জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা হবে।**
- **পিকেএসএফ-এর ৮ মিলিয়ন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ৯১ শতাংশ নারী। সকল ক্ষুদ্র ঋণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।**
- **আশ্রয়ণ প্রকল্পের পরিধি আরও বৃদ্ধি করে সবার জন্য বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।**

বৈষম্য হ্রাস

ধনী-দরিদ্র ও শহর-গ্রাম পর্যায়ে আয় বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সাফল্য ও অর্জন

- বৈষম্য দূরীকরণের নীতি, কৌশল এবং তার আলোকে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কর্মসূচির সাথে অন্তর্ভুক্ত ছিল কর্মসংস্থান, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও মজুরি বৃদ্ধি, গরিবদের জন্য অধিকতর সুবিধাসহ মানব পুঁজির উন্নয়ন, বিভিন্ন এসএমই-র জন্য ক্ষুদ্র ঋণসহ বিভিন্ন ঋণদান সুবিধার সম্প্রসারণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যয় বৃদ্ধিসহ এর কার্যকারিতার উন্নতি সাধন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পল্লি উন্নয়নে অধিকতর প্রাধান্য দানসহ সরকারি ব্যয় নির্বাহের সংস্কার কর্মসূচির কাজ ক্রমে অগ্রসর করে নেওয়া হচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **বৈষম্য দূরীকরণে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচির পরিধি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে জোরদার করা হবে।**

৩.১৪ কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি : খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে নিশ্চয়তা

বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের অভূতপূর্ব সাফল্য বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত ও কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করা টেকসই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এখন খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি এবং সবার জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিধানে এগিয়ে যাওয়া আমাদের সুদৃঢ় প্রত্যয়।

সাফল্য ও অর্জন

- সরকারের নীতি সহায়তা এবং মানসম্পন্ন উপকরণ সরবরাহের ফলশ্রুতিতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ২০০৮-০৯ সালের সাড়ে ৩ কোটি টন থেকে গত ১০ বছরে প্রায় ৪ কোটি ১৩ লাখ

টনে উন্নীত হয়েছে। চাল উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ স্থানে, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, মাছ চাষে তৃতীয়, আম উৎপাদনে সপ্তম এবং আলু উৎপাদনে অষ্টম স্থানে রয়েছে। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে এখন অন্য দেশেও চাল রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

- ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কৃষক ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছে। ইতোমধ্যে ৯ লাখ ৩৬ হাজার ৯৩৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।
- শাক-সবজি ও ফলমূল রপ্তানিতেও আমরা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের কৃষি গবেষণা উদ্ভাবিত উন্নত ধানের জাত এশিয়া ও আফ্রিকার অন্তত ২০টি দেশে আবাদ হচ্ছে।
- আমাদের কৃষিবান্ধব নীতি, ভর্তুকি ও প্রযুক্তি সহায়তা, কৃষি সম্প্রসারণ ও গণমাধ্যম কার্যক্রমের বদৌলতে সনাতন কৃষি এখন বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং কৃষি ধীরে ধীরে একটি লাভজনক অভিজাত পেশা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। যার ফলে কৃষি পেশাতে গ্রামীণ শিক্ষিত যুবক-যুবতী ও নারী উদ্যোক্তাগণ আকৃষ্ট হচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **সবার জন্য পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের জোগান দেওয়ার লক্ষ্যে দ্রুত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের সফল ধারা অব্যাহত রাখা হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সময়মতো মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তুকি অব্যাহত রাখা হবে।**
- **কৃষিতে শ্রমিক সংকট লাঘবের জন্য সহজে ব্যবহার্য ও টেকসই কৃষি যন্ত্রপাতি সুলভে সহজপ্রাপ্য করা হবে।**
- **সহজ শর্তে সময়মতো কৃষি ঋণ, বিশেষ করে বর্গাচাষিদের জন্য জামানতবিহীন কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। মহিলা কৃষকদের জন্য গৃহাঙ্গন ও মাঠে ফসল চাষের জন্য কৃষি ঋণ আরও সহজপ্রাপ্য করা হবে।**
- **খাদ্যশস্যের পাশাপাশি আলু, শাক-সবজি, তৈলবীজ, মসলা, নানা জাতীয় ফলমূল, ফুল, লতাপাতা-গুল্ম, ঔষধি ও ফসল উৎপাদনে বর্তমানে প্রদত্ত সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হবে।**
- **স্থানীয় পর্যায়ে কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি পণ্যের দক্ষ সাপ্লাই চেন/ভ্যালু চেইন গড়ে তোলা হবে। সে-সঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।**
- **কৃষি গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ ইতোমধ্যে বাড়ানো হয়েছে এবং কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হবে। বিশেষ করে জীবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ন্যানো প্রযুক্তি, সংরক্ষণশীল ও সুনির্দিষ্ট কৃষি, হাইব্রিডাইজেশন, জিএম ফুড ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।**
- **ইতোমধ্যে পাট ও ইলিশ মাছের জেনম আবিষ্কারের ফলাফলকে অধিকতর উৎপাদনশীল ও লাভজনক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে উৎসাহ ও সহযোগিতা দেওয়া হবে।**

- **উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো, কৃষক সংগঠন (এফএফএস), বিপণন সংগঠন, সমবায় সমিতি ও কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা হবে।**
- **জলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিকূল কৃষি-আবহাওয়া অঞ্চল যেমন– লবণাক্ত অঞ্চল, হাওড় ও চরাঞ্চল, পার্বত্যাঞ্চল ও বরেন্দ্র অঞ্চলসমূহের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জীবিকায়নের ওপর জোর দেওয়া হবে।**

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের প্রয়োজন মেটানো, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আগামী মেয়াদে সরকারের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। বিপুল জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ খাতে জড়িত আছেন।

সাফল্য ও অর্জন

- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ২৯.৫০ লাখ মেট্রিক টন, ১৯.৯০ লাখ মেট্রিক টন ও ৬০৭.৮৫ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯৪.০৬ লাখ মেট্রিক টন, ৭২.৬০ লাখ মেট্রিক টন ও ১,৫৫২.০০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।
- মৎস্য খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ অনেক অগ্রসর হয়েছে। বিগত ৯ বছরে মাছের উৎপাদন ২৭.০১ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ৪১.৩৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।
- হাঁস-মুরগি, গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রণোদনা, সহজ শর্তে ঋণ ও কর মওকুফ সুবিধা দিয়ে এসবের লাভজনক বাণিজ্যিক প্রসারে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **২০২৩-এর মধ্যে হাঁস-মুরগির সংখ্যা দ্বিগুণ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**
- **প্রাণী খাদ্য, গবাদি পশুর ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজপ্রাপ্য করার ওপর জোর দেওয়া হবে। সে-সঙ্গে এগুলোর জন্য যাতে ভালো দাম পাওয়া যায়, তার জন্য বাজার-ব্যবস্থা ও বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধার আরও উন্নয়ন করা হবে।**
- **ছোট ও মাঝারি আকারের দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য চাষের জন্য সহজ শর্তে ঋণ, প্রয়োজনমতো ভর্তুকি, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও নীতি-সহায়তা বৃদ্ধি করে তা অব্যাহত রাখা হবে।**
- **পুকুরে মাছ চাষ ও যেখানে সম্ভব ধানক্ষেতে মাছ চাষের আরও প্রসারের জন্য উন্নত জাতের পোনা, খাবার, রোগব্যাধির চিকিৎসা, পুঁজিসংস্থান ও সুলভে বিদ্যুৎ সংযোগসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রাখা হবে।**

- **মৎস্য খাতের উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণার ব্যাপক মানোন্নয়ন, কৃষকদের সম্পৃক্ত করে মাছ চাষের ব্যবস্থাপনাগত উন্নতি সাধন ও ধৃত মাছের অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতিহ্রাস করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
- **সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.৩১ শতাংশ। এটাকে আরও বৃদ্ধি করা হবে।**

৩.১৫ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি যে কোনো দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার একটি অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। বঙ্গবন্ধু সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদে জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশীয় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। পঁচাত্তরের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তি ক্ষমতাসীন হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা অবহেলার শিকার হয়। ১৯৯৬-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে পরিস্থিতির উন্নতি হয়। পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় লুটপাটের ফলে আবারও মুখ থুবড়ে পড়ে। দেশ এখন আবার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

সাফল্য ও অর্জন

- জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুগান্তকারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, উন্নয়নশীল বিশ্বের একমাত্র সরকারপ্রধান যিনি জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টিকে জাতীয় নিরাপত্তার সমার্থক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
- ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে।
- অতীতের সরকারগুলো জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীলতার ভ্রান্তনীতি পরিবর্তন করে বর্তমান সরকার জ্বালানির বহুমুখীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে।
- বর্তমানে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৬৪ কিলোওয়াট, ২০০৮ সালে ছিল ২২৮ কিলোওয়াট, অর্থাৎ অর্ধেকেরও কম। এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ, যা ২০০৮ সালে ছিল ৪৭ শতাংশ।
- বর্তমানে সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষমতা ২০,৪০০ মেগাওয়াট, যার মধ্যে নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা ১৯,২৪০ মেগাওয়াট এবং ভারত থেকে আমাদের চেয়ে কম মূল্যে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ ১,১৬০ মেগাওয়াট। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে ৩,২৬৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে।
- বর্তমানে ১৩,৬৫৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৫টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে।

- বর্তমান সরকারের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরে 'সিস্টেম লস' (কারিগরি ও অকারিগরি লস) ইতোমধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে আনা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি 'এনার্জি ডিপ্লোমেসি'কে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক পর্যায়ে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। এই খাতের যুগান্তকারী ঘটনা, ভেড়ামারা ও ত্রিপুরায় ক্রসবর্ডার কানেকশন।
- ভারতের ঝাড়খন্ড ও ত্রিপুরা থেকে যথাক্রমে ১,৪৯৬ ও ৩৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ভুটান ও নেপাল থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ভারত অংশীদার হিসেবে থাকছে।
- সমুদ্র বিজয়ের ফলশ্রুতিতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের সুযোগ সৃষ্টিসহ ৭টি সমুদ্র ব্লকে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহ একক ও যৌথভাবে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। মহেশখালীতে স্থাপিত ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল থেকে ৫০০ ঘনফুট গ্যাস যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে গ্যাসের দৈনিক সরবরাহ ৩,২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট, ২০০৮ সালে ছিল ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট।
- ৪টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র (শ্রীকাইল, সুন্দরপুর, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ) আবিষ্কৃত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্সের জন্য ৪টি রিগ ক্রয় এবং একটি পুরাতন রিগ পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ২০১১ সালে 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' গঠন করা হয়েছে। যার আওতায় বর্তমানে ২১টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ২০১5 সালে 'এনার্জি সিকিউরিটি ফান্ড' নামে আরেকটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।
- এই সরকারের সময় ৮৬২ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। আরও ৩৫৭ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২০১৮ সালে দেশে মোট ৮৬.৩২ লাখ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল সরবরাহ করা হয়েছে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ছিল ৪০.৪৩ মেট্রিক টন।
- ২০০৯ সালে এলপিজি-র সরবরাহ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে ২০১৮ সালে ৭ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে।
- দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন সন্দ্বীপকে সাবমেরিন লাইনের মাধ্যমে জাতীয় গ্রিডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ সহায়তা দেওয়ার জন্য লাইফ লাইনে প্রতি ইউনিটে ৪ টাকা, নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য ৩.৫০ টাকা, কৃষিতে ৮৮ শতাংশ, কৃষির গ্রাহককে তার মোট বিলের ওপর ২০ শতাংশ, মধ্যবিত্তের জন্য (৩০০ ইউনিট পর্যন্ত ব্যবহারকারী) ৪৫ শতাংশ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- ২০২৩ সালের মধ্যে ২৮,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রায় ২৩,০০০ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করা হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে প্রায় ৫ লাখ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।
- মহেশখালী ও মাতারবাড়ী অঞ্চলে একটি এবং পায়রাতে একটি করে 'এনার্জি হাব' গড়ে তোলা হবে।
- ২০১৯ সালের এপ্রিল মাস থেকে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন আরও একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজ শেষ হবে।
- ২০২৩ সালের মধ্যে মোট ৫,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমপরিমাণ এলএনজি সরবরাহ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত ১৩০ কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ৩০৫ কিলোমিটার পাইপলাইন, গভীর সমুদ্র থেকে চট্টগ্রামে তেল আনার লক্ষ্যে পাইপ লাইনসহ ইতোপূর্বে গৃহীত অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
- ইস্টার্ন রিফাইনারির (ইআরএল) জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা ১৫ লাখ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি করে ৪৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হবে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে রিফাইনারি প্রতিষ্ঠায় সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।
- দেশের কয়লা সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

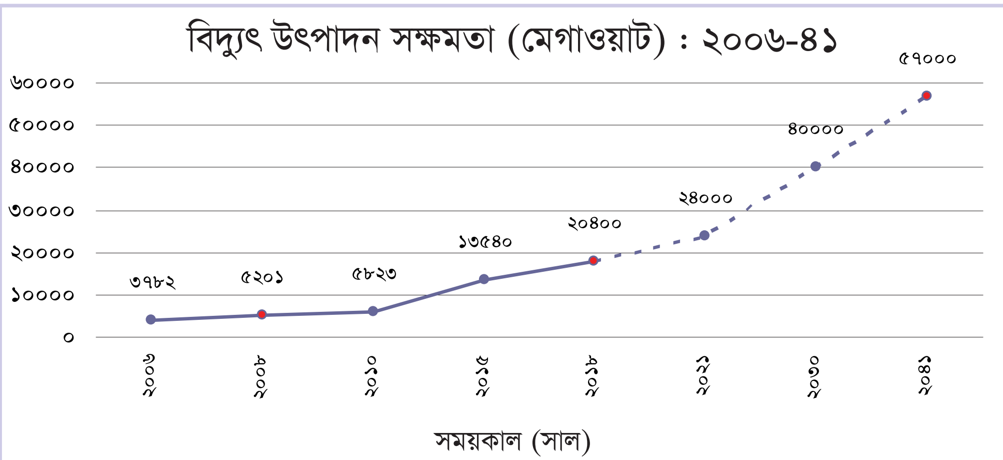

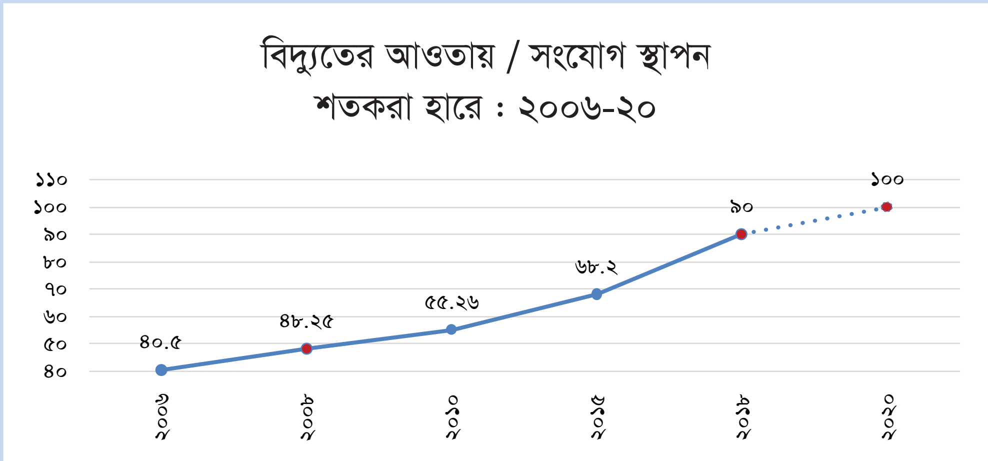

৩.১৬ শিল্প উন্নয়ন

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিল্পায়নের গুরুত্ব খুবই বেশি। দেশে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত তরুণ-যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও কাজের উৎস সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার বিপুল শ্রমশক্তি কাজে লাগাতে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পভিত্তিক শিল্প উন্নয়ন কৌশলের ওপর জোর দিয়ে যাচ্ছে। সে-সঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে ভারী ও মৌলিক শিল্প– যে শিল্পকে ভিত্তি করে বহুমাত্রিক সংযোজন শিল্প গড়ে উঠবে।

সাফল্য ও অর্জন

- সরকার অব্যাহতভাবে পোশাক শিল্পের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা বা প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছে। এই খাতে মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশের বেশি দেশজ শিল্পের অবদান।
- বিশ্বব্যাপী পরিবেশ ধ্বংসকারী পলিথিন ও প্লাস্টিক পণ্য নিষিদ্ধকরণের ফলে পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ছে। ইতোমধ্যে সরকারের সহযোগিতায় বিজ্ঞানীরা পাটের জন্ম রহস্য উন্মোচনসহ পলিথিনের বিকল্প সোনালি ব্যাগ উদ্ভাবন করেছেন। পাট পণ্যের সংখ্যা ৩৫ হতে বেড়ে ২৮৫-তে দাঁড়িয়েছে।
- শিল্পায়নে জমির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ১০০টি সরকারি ও বেসরকারি ইকোনমিক জোন স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে; এ পর্যন্ত ৮৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং ১৪টির কাজ এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি (বিইজেডএ) এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।
- প্রতিটি শিল্পাঞ্চলে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- সাভারে চামড়া শিল্পের বর্জ্য শোধনকারী কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে, যা পরিবেশবান্ধব শিল্পের শর্ত পূরণ করে চামড়া জাতীয় পণ্যের রপ্তানি বহুগুণ বৃদ্ধি করবে।

- দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কর অবকাশসহ বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ইকোনমিক জোনের জন্য বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- বিগত ১০ বছরে ইপিজেডে ৪৭৬টি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে।
- বন্ধুপ্রতিম দেশ চীন, জাপান ও ভারতের জন্য ৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চল সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা দান, তাঁত শিল্প রক্ষা ও রেশম, বেনারসি এবং জামদানি পল্লি গড়ে তুলে তাঁতি, কামার, কুমার ও মৃৎশিল্পীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান ও ঋণের শর্ত সহজীকরণের জন্য পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা ইউনিট খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যাতে জামানতের অভাবে ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে-লক্ষ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
- বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ) গঠন, বিভিন্ন প্রকার রপ্তানি প্রণোদনা ও ২৭টি রপ্তানি পণ্যে ২ থেকে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা প্রদান, ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু এবং ইজি অব ডুইং বিজনেস ক্রম উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে আর্থিক প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হবে।**
- **শিল্পায়নের প্রবৃদ্ধি অর্জনে সম্পদ ও উপাদান হিসেবে প্রযুক্তির উদ্ভাবনে দেশীয় গবেষণাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে গবেষণায় ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে।**
- **শিল্প স্থাপনের বাধা বিশেষত, ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিলতা দূর করা হবে।**
- **দেশে যেসব পণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে সেসব ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত প্রতিরক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রণোদনা দেওয়া হবে।**
- **কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে বিশেষ গুরুত্বসহকারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।**
- **পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, চামড়া, খেলনা, জুয়েলারি, আসবাবপত্র, পর্যটন– এসব খাত এই কর্মসূচির সুবিধা পাবে।**
- **ঔষধ শিল্প ও ঔষধের কাঁচামাল প্রস্তুতকারী অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া হবে। ডব্লিউটিও অনুন্নত দেশের জন্য এপিআই শিল্পকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত বিবিধ রেয়াত দিয়েছে, যার সুফল গ্রহণের জন্য গৃহীত নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।**
- **পিপিপি আইন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো সংস্কার করা হবে। বিডা (বিআইডিএ)-কে অধিকতর কার্যক্ষম করা হবে।**

- **অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো আনুমানিক অতিরিক্ত ৪০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বৃদ্ধি করবে এবং প্রায় ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করবে।**
- **পদ্মাসেতুর দুই পাড়ে সিঙ্গাপুরের আদলে শিল্পনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।**
- **জেলা শহর ও মফস্বল শহরে স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুচ্ছ শিল্পাঞ্চল (ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রি) গড়ে তোলা হবে। সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পকে গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি গুচ্ছশিল্প কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা হবে।**
- **সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে বগি ও কোচ উৎপাদন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।**
- **বিভাগীয় শহরে আইটি শিল্প পার্ক স্থাপন এবং এসব শিল্প পার্কে আগামী পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।**
- **শিল্পের ভিত্তি মজবুত এবং আধুনিকায়নে ভারী ও মৌলিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, যাকে কেন্দ্র করে শিল্পনগরী গড়ে উঠবে।**
- **জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে।**

৩.১৭ শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমনীতি

মালিক-শ্রমিক এবং শ্রম ও মজুরির সম্পর্ক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার পূর্বশর্ত। সংবিধানের আলোকে এবং আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমনীতি ও শ্রমিক কল্যাণে বহুমুখী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগ দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

সাফল্য ও অর্জন

- বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০১৩, বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা-২০১৫, শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ৪৩টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৪০টি সেক্টরে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি শতভাগ বৃদ্ধি করে ৮ হাজার ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে; ২০১০ সালে ছিল ১ হাজার ৬৬২ টাকা, ২০১৩ সালে বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩০০ টাকা করা হয়েছিল।
- বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের ৬১ হাজার ৯৫ শ্রমিক ও কর্মচারীর ২০১৭-১৮ সালের বকেয়া মজুরি/বেতন বাবদ ৮০০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে এ পর্যন্ত ২ হাজারের অধিক জনকে প্রায় ১০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

- নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা তথা পেশাগত রোগের চিকিৎসার জন্য নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গীতে দুটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩২টি এবং প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৮ গুণ। ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়াসহ ১৮টি দেশে ১৯টি শ্রম উইং খোলা হয়েছে।
- শিশুশ্রম বন্ধের লক্ষ্যে শিশুদের শিক্ষা, বৃত্তি ও নানাবিধ সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ তৈরি পোশাক এবং চিংড়িসহ হিমায়িত মৎস্য শিল্পে শতভাগ শিশুশ্রম মুক্তকরণ এবং ৩৮টি সেক্টরকে ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করে এসব শিল্পে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- কৃষি শ্রমিকদের শ্রম আইন-২০১৩-এ শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা হবে।**
- **নারী শ্রমিকদের জন্য চার মাসের বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হবে।**
- **শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা, বাসস্থান, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।**
- **গার্মেন্ট শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় নানা পদক্ষেপের সঙ্গে রেশনিং প্রথাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

প্রবাসী কল্যাণ

- **বিভিন্ন দেশে আরও বেশি সংখ্যক প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণের এবং তাদের শ্রমলব্ধ অর্থের আয়বর্ধক এবং লাভজনক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত নীতি-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হবে।**
- **বিদেশে যাওয়ার সময় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে নমনীয় শর্তে ও সুদে এবং দেশে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করা হবে।**

৩.১৮ শিক্ষা

আজকের বিশ্ব জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিশ্ব। শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-জাতি যত সাফল্য অর্জন করবে, সে-জাতি জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নে ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে ততটাই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করবে। অঙ্গীকার অনুযায়ী বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকার শুরু থেকেই শিক্ষার অধিকার ও মানোন্নয়নের ওপর অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গুরুত্বারোপ করে আসছে। ফলশ্রুতিতে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসারে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

সাফল্য ও অর্জন

- সুশিক্ষিত ও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে।
- ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল, ভোকেশনাল স্তরের সর্বমোট ২৬০ কোটি ৮৫ লাখ ৯১ হাজার বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারির প্রথম দিনে ৪ কোটি ৪২ লাখ ৪ হাজার শিক্ষার্থী ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার নতুন বই পেয়েছে।
- ৫টি নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ৭৭ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণির ১ লাখ ৪৯ হাজার পাঠ্যপুস্তক ও পঠন-পাঠন সামগ্রী মুদ্রণ করা হয়।
- দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রথমবারের মতো ৯ হাজার ৭০৩ কপি ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়।
- ২৬ হাজার ১৫৯টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৪২ হাজার শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের বকেয়া পেনশন সুবিধা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে অবসরপ্রাপ্ত ২৩ হাজার ৩২৬ শিক্ষকের পেনশনের জন্য ৭৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- ১ লাখ ৬৫ হাজার ২২৫ সহকারী শিক্ষক এবং ৪ হাজার ৪০০ প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১০ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা প্রদান এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন দুই ধাপ উন্নীত করা হয়েছে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৭ হাজার ৬৭২টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১ হাজার ৪৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- ১ হাজার ১৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, ১৩ হাজার ২২১টি পুনর্নির্মাণ ও মেরামত, ৩৯ হাজার ৩টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১২টি নতুন পিটিআই নির্মাণ ও ৫৫টি পিটিআই সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করে ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত মোট প্রায় ২ কোটি ৫৫ লাখ ৩৪ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪ হাজার ৬১৫ কোটি টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- বৃত্তি প্রদান, ফল প্রকাশ, ভর্তি, পাঠ্যপুস্তকের ভার্সন ইত্যাদি বিষয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ২৬ হাজার ৬৫৫টি মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ এবং ৩৫০টি আইটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।
- সকল উপজেলায় অন্তত একটি কলেজ ও একটি করে স্কুল সরকারিকরণ করা হয়েছে।
- ১৯ হাজার ৯৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ হাজার ১১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণ এবং ১৮ হাজার ৬৮০টি প্রতিষ্ঠানে ভবন নির্মাণকাজ চলমান আছে।
- প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে ১০০টি উপজেলায় স্থাপনের কার্যক্রম চলছে।
- ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (৪টি মহিলা) স্থাপন এবং ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।
- বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭৯ হাজার ৬১ শিক্ষক এমপিওভুক্ত হয়েছে।
- এমপিওভুক্ত ১ হাজার ৬৭৩টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ১৩ হাজার ৮৮৬ শিক্ষক শতভাগ বেতন সরকার থেকে পাচ্ছেন।
- বিগত ১০ বছরে ৩৩৫টি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। মোট ১ লাখ ২১ হাজার ৯২৬ জন এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষক ১০০ শতাংশ বেতন সরকার থেকে পাচ্ছেন।
- কওমী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমতুল্য এবং কওমী মাদ্রাসার দাওরায়ে (তাকমীল) স্তরের শিক্ষাকে এমএ সমতুল্য করা হয়েছে।
- কোরআন ও সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।
- ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের মেয়াদে ১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়সহ মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ভেটেনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স, ডিজিটাল, ইসলামি আরবি, মেরিটাইম, প্রফেশনাল, ফ্যাশন ও টেক্সটাইল প্রভৃতি বিশেষায়িত ও বিষয়ভিত্তিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ ও তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষা পাঠক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে– শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান আহরণ এবং দেশ ও জাতির অবিকৃত সত্য ইতিহাস জানার অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা।**

- শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে। ভাষা জ্ঞান ও গণিত জ্ঞানের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ভাষা ও গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।
- বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা হবে। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। গত এক দশকে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ২০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
- স্কুল ফিডিং সকল গ্রামে, আধা মফস্বল শহরে এবং শহরের নিম্নবিত্তের স্কুলসমূহে পর্যায়ক্রমে সার্বজনীন করা হবে।
- প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে, তা অব্যাহত থাকবে।
- শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগের একমাত্র মানদণ্ড হবে মেধা, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা।
- প্রশ্নপত্র ফাঁস ও নকল সর্বতোভাবে বন্ধ করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা জোরদার করা হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় উৎসাহিত ও সহায়তা প্রদান করা হবে। এজন্য বাজেট বৃদ্ধি করা হবে। সকল জেলায় অন্তত একটি প্রাইভেট বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।
- মাদ্রাসা শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার সাথে কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদানের জন্য কারিকুলাম যুগোপযোগী করা হবে।
- নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করে প্রয়োজনীয় সকল বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে।
- সকল দৃষ্টি-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পর্যন্ত সব স্তরের বই ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতিবন্ধীদেরও মানবসম্পদে পরিণত করা হবে।
- শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সরকারের নানা কল্যাণমুখী ও যুগোপযোগী উদ্যোগ সত্ত্বেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন গ্রেডসহ শিক্ষা খাতের কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে বৈষম্য এখনও রয়ে গেছে, আগামী মেয়াদে তা ন্যায্যতার ভিত্তিতে নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩.১৯ স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ

সকলের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতি। রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১-এর মাধ্যমে আমরা দেশকে এমন এক জায়গায় নিতে চাই, যেখানে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সকল নাগরিক উন্নত জীবন উপভোগ করতে পারে।

সাফল্য ও অর্জন

- ১৯৯৬-২০০১ পর্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতি ৬ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে ৪ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা এবং ৪৫ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩.৪৮ থেকে ১.৭২ এবং শিশুমৃত্যুর হার ৪১ থেকে ২৪ জনে নামিয়ে আনা হয়েছে।
- মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল এখন ৭২.৮ বছর, যা ২০০৯-এ ছিল ৬৬.৮ বছর।
- ৫৩টি উপজেলায় মাতৃ-ভাউচার কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি বীমা চালু করা হয়েছে।
- প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রসবকালীন সেবা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মিডওয়াইফ পদায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।
- সারাদেশে আধুনিক কল সেন্টার 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফোনে ও অনলাইনে চিকিৎসাসেবা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আরও উন্নত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। ৬০টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিনসেবা চালু করা হয়েছে।
- অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ২০৩টি অ্যাডলেসেন্ট ফ্রেন্ডলি হেলথ কর্নার স্থাপন এবং ১৪টি জেলায় ১৮৯টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্যসেবা চালু করা হয়েছে।
- ৩ হাজার ১৩১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মধ্যে ২ হাজার ২০০টিতে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা নিরাপদ প্রসবসেবা চালু করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মানের ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি অ্যান্ড হসপিটাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নতুন করে মোট ১ লাখ ৩৭ হাজার ২৪টি শয্যা স্থাপন করা হয়েছে। ১০ বছরে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হয়েছে। বর্তমানে শয্যা ও রোগীর অনুপাত ১:১১৬৯, যা ২০০৬ সালে ছিল ১:২৬৬৫।
- ১০ বছরে ১০ হাজার ৮৮৮ চিকিৎসক এবং ২১ হাজার ৬৮৮ নার্স নিয়োগ করা হয়েছে। আরও ১ হাজার চিকিৎসক এবং প্রায় ৮ হাজার নার্সের নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে।
- বর্তমানে দেশীয় চাহিদার ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। পৃথিবীর ১৪৫টি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে।

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল; জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিকাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস অ্যান্ড হসপিটাল, চট্টগ্রাম; শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট; বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, গোপালগঞ্জ; ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক নিউরো-ডিজঅর্ডার অ্যান্ড অটিজম (ইপনা); শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট অ্যান্ড হসপিটাল; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন স্থাপন করা হয়েছে।
- ১১১টি নতুন সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছে। নার্সিংয়ে ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা প্রাপ্তি উন্নত করা হবে।**
- **এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হবে।**
- **সকল বিভাগীয় শহরে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।**
- **প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হার্ট, ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা হবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অন্তত ১০০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্যানসার ও কিডনি চিকিৎসা-ব্যবস্থা চালু করা হবে।**
- **সব ধরনের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতালগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলন করে স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থাকে আরও নির্ভুল ও জনবান্ধব করা হবে। অনলাইনে দেশ-বিদেশ থেকে বিশেষায়িত চিকিৎসকের সেবা পাওয়া যাবে।**
- **কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর ভবনসহ সব সুবিধা পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ করা হবে।**
- **আয়ুর্বেদী, ইউনানী, দেশজ ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার মানোন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখা হবে।**
- **গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মান বৃদ্ধি এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে।**

৩.২০ যোগাযোগ

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে– উন্নত দক্ষ ও নিরাপদ যোগাযোগ-ব্যবস্থা। যোগাযোগ খাতে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে যে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তা এখন সর্বমহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার খাত হিসেবে যোগাযোগ-ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, সুগম ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে সড়ক, রেল ও নৌপথের সম্প্রসারণ ও সংস্কার বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে ৪৫ হাজার ৪৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল সড়কপথ, রেলপথ, বিমানপথ ও জলপথ যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি (রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১) সামনে রেখে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতোমধ্যে দেশবাসী এর সুফল পেতে শুরু করেছে।

সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ

সাফল্য ও অর্জন

- ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে দেশের বৃহত্তম পদ্মা বহুমুখী সেতুর ৬২ শতাংশ নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেতুটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে জিডিপি ১.২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক পদ্মাসেতু দক্ষিণবঙ্গের মানুষের জীবনধারাই শুধু পাল্টাবে না, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল হবে।
- ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক ৪ হাজার ৩৩১ কিলোমিটার সড়ক মজবুতকরণসহ ৫ হাজার ১৭১ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্ত এবং ৪ হাজার ৮৬৯ কিলোমিটার মহাসড়ক কার্পেটিং ও সিলকোট, ১ হাজার ৮৯২ কিলোমিটার ডিবিএসটি এবং ৮ হাজার ১৫৮ কিলোমিটার ওভারলে করা হয়েছে।
- ৪১৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক চার-লেনে উন্নীত করা হয়েছে : ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ, নবীনগর-চন্দ্রা, রংপুর মহানগর এবং চট্টগ্রাম-হাটহাজারী। গাজীপুর থেকে টাঙ্গাইলের এলেঙ্গা পর্যন্ত চার-লেনে উন্নীত করার কাজ সমাপ্তির পথে। যাত্রাবাড়ী থেকে কাঁচপুর পর্যন্ত আট-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। কর্ণফুলী নদীতে ট্যানেল নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।
- ৯১৪টি সেতু, ৩ হাজার ৯৭৭টি কালভার্ট নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা, টঙ্গী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও ফেনীতে ৭টি ফ্লাইওভার এবং বেশ কিছু আন্ডারপাস নির্মাণ করা হয়েছে।
- ঢাকা মহানগরীর যানজট সমস্যা নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে উত্তরা (তৃতীয় পর্ব) হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। যার স্টেশন থাকবে ১৬টি এবং প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন সক্ষমতা থাকবে।
- হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৭০৩.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে র‍্যাম্পসহ প্রায় ৪৬.৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প চলমান রয়েছে।
- ৯৩৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মোট ২০ কিলোমিটার বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে।

- চীন সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ১৬,৯০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি প্রকল্পও সরকার সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে।
- গত ১০ বছরে ৩৩০.১৫ কিলোমিটার নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৯১টি স্টেশন বিল্ডিং, ২৪৮.৫০ কিলোমিটার মিটারগেজ থেকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর, নতুন ৭৯টি রেলস্টেশন নির্মাণ এবং ২৯৫টি রেলসেতু নির্মাণ করা হয়েছে। রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য ৩০ বছর মেয়াদি একটি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে।
- ৪৩০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন শেষে রেলওয়ের বহরে সংযুক্ত করা হয়েছে।
- লালমনিরহাট হতে বুড়িমারি, কালুখালী থেকে ভাটিয়াপাড়া ও পাঁচুরিয়া থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বন্দর রেল সেকশন পুনঃচালু করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকারের আওতায় ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৫২ হাজার ২৮০ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৭৫ হাজার ৭৭৩ কিলোমিটার পাকা সড়ক, ৩১ হাজার ৬৩৭ মিটার ব্রিজ পুনর্নির্মাণ এবং ৩ লাখ ১ হাজার ৩৪১ মিটার কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে।
- ১০টি নতুন বিমান ক্রয় করা হয়েছে এবং আরও ৫টি কেনার চুক্তি হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৬,৩৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯.২৪ কিলোমিটার বিস্তৃত ঢাকা পূর্ব-পশ্চিম এলিভেটেড হাইওয়ে নির্মাণ করা হবে।**
- **ঢাকাকে ঘিরে একটি এলিভেটেড রিংরোড এবং ইস্টার্ন বাইপাস নির্মাণেরও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।**
- **ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে এবং এক্সপ্রেস রেলওয়ে নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।**
- **মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে যাতে চট্টগ্রামে পৌঁছানো যায় সেজন্য বুলেট ট্রেন (দ্রুতগামী ট্রেন) চালু করা হবে। ক্রমে বুলেট ট্রেন সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, খুলনা এবং কলকাতা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।**
- **রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল বিমানবন্দরকে উন্নত করা হবে। ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে থার্ড টার্মিনাল নির্মাণ, নতুন রাডার স্থাপন ও জেট ফুয়েল সরবরাহ করার জন্য পাইপলাইন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হবে।**
- **কক্সবাজারে প্রতিষ্ঠা করা হবে সুপিরিয়র বিমান অবতরণে সক্ষম দেশের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন বিমানবন্দর। বাগেরহাটে খানজাহান আলী বিমানবন্দর নির্মাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।**
- **ইতোমধ্যে 'নিরাপদ সড়ক আইন-২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে দুর্ঘটনা ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আগামীতে সময়ের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে নতুন ধারা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে এটাকে আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করা হবে।**

- **নিরাপদ সড়কের জন্য লাইসেন্সবিহীন চালকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, ট্রাফিক-ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা, ফিটনেসবিহীন গাড়িকে পারমিট না দেওয়া, চালকদের লাইসেন্স প্রদানে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করা, সড়ক ও মহাসড়কগুলোকে ক্রমে সিসিটিভি-র আওতায় আনা এবং জনসাধারণকে সচেতন করা প্রভৃতি ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।**
- **বেসরকারি বিমান পরিবহনকে আরও উৎসাহিত করা হবে।**
- **স্বল্প খরচে রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে।**
- **রাজধানী ঢাকার জনপরিবহন সমস্যার সমাধান ও যানজটমুক্ত করার লক্ষ্যে পাতাল রেল, মেট্রোরেল অথবা সার্কুলার রেলপথ এবং রাজধানীতে নাব্য ও প্রশস্থ নৌপথ নির্মাণ করা হবে।**
- **সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে উন্নত করে আঞ্চলিক বিমানবন্দর হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যাতে আমাদের সীমান্তবর্তী ভারতের ৭টি প্রদেশ এবং নেপাল ও ভুটান এই বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারে।**
- **ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে, বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল এবং বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক জোটের যোগাযোগ-ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে।**

নৌপথ ও বন্দর

বাংলাদেশে সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহ্যগতভাবে নৌপথ একটি নিরাপদ ও সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ ও দরিদ্রবান্ধব যোগাযোগমাধ্যম। এক সময় যোগাযোগের ৮৫ শতাংশ হতো নৌপথে। দেশে সর্বমোট প্রায় ২৪ হাজার কিলোমিটার নৌপথ রয়েছে। যার মাত্র ৬ হাজার কিলোমিটার পরিবহন কাজে ব্যবহার করা হয়, শুষ্ক মৌসুমে অর্ধেকে নেমে আসে। অভ্যন্তরীণ নৌপথের পুনরুদ্ধার ও সর্বোচ্চ ব্যবহার আবশ্যক।

সাফল্য ও অর্জন

- ইতোমধ্যে ২০০৯-১৫ সময়ে খনন করা হয়েছে ১ হাজার ২০০ কিলোমিটার নৌপথ। সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩টি নৌপথে খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১ হাজার ২৭০ কিলোমিটার নৌপথ এবং প্রায় ৩ হাজার একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে।
- মোংলা-ঘষিয়াখালী নৌপথ খনন করে সুন্দরবন রক্ষার্থে নৌ-সংযোগ চালু করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোংলা বন্দরে লাভ হয়েছে ৯৫ কোটি টাকা। কিন্তু ২০০১-০৬ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় মোংলা বন্দরে ১১.৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছিল।

- চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর দুটিকে আধুনিকায়নসহ পটুয়াখালীতে পায়রা সমুদ্রবন্দর স্থাপন করা হয়েছে।
- চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে কন্টেইনার ঢাকায় আনা-নেওয়ার জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জের পানগাঁওয়ে বুড়িগঙ্গা নদীতে বার্ষিক ১ লাখ ১৬ হাজার ক্ষমতাসম্পন্ন টিইইউ'স কন্টেইনার হ্যান্ডলিং টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে।
- দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধুর সরকার ৭টি ড্রেজার সংগ্রহ করেছিল। দীর্ঘ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯-১৩ সময়কালে ১৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করে। বর্তমানে ২ হাজার ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ২০টি ড্রেজার সংগ্রহের প্রকল্প হাতে রয়েছে।
- নদীপথে দেশে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮ সালে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত নৌযানের সংখ্যা হয়েছে ১২,০০০। ২০০৯ সালে সংখ্যা ছিল ৬,০০০।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **ব্যাপক খননের পরিকল্পনা হিসেবে আগামী মেয়াদে প্রায় ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হবে। আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দরের সাথে অভ্যন্তরীণ নৌপথগুলোর সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সুগম করা হবে।**
- **আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্যকে সহজতর করার লক্ষ্যে ভারতের সাথে নৌপথ বাণিজ্য আরও বাড়িয়ে একে নেপাল-ভুটান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে।**
- **২০২৩ সালের মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে মাতারবাড়ী সমুদ্রবন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।**
- **অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বে-টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বন্দরের সক্ষমতা ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে।**
- **ঢাকার চারপাশের ৪টি নদী এবং খালগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে খননের মাধ্যমে নাব্য ফিরিয়ে এনে নদীতীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।**

৩.২১ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ : তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

আমাদের সামনের দিনের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ডিজিটাল যুগে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সামনের কাতারে থাকা। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে মুজিব বর্ষ-২০২০, ডিজিটাল বাংলাদেশ বর্ষ-২০২১, এসডিজি বর্ষ-২০৩০ ও উন্নত বাংলাদেশ বর্ষ-২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়ন করা। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ডিজিটাল ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিপ্লব চলছে, তা ক্রমে যুগোপযোগী করে অগ্রসর করার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠবে তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ।

সাফল্য ও অর্জন

- ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার বাস্তবতা ইতোমধ্যে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান করা সম্ভব হয়েছে।
- থ্রি-জি মোবাইল প্রযুক্তির পর দেশে ফোর-জি মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করা হয়েছে। মোবাইল প্রযুক্তিকে আরও সুরক্ষিত করতে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধিত হচ্ছে।
- ৫ হাজার ৭৩৭টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮ হাজার ২০০টি ই-পোস্ট অফিসের মাধ্যমে জনগণকে ২০০ ধরনের ডিজিটালসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- দেশে মোবাইল সিম গ্রাহক ১৫ কোটি ৪১ লাখ ৭৯ হাজার। ইন্টারনেট গ্রাহক ৯ কোটি ৫ লাখ ১ হাজার।
- ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েবপোর্টাল 'তথ্য বাতায়ন' চালু করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি স্মার্টকার্ড এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে।
- মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে মহাকাশ বিজ্ঞানের যুগে।
- লার্নিং-আর্নিং, শি-পাওয়ার, হাইটেক পার্ক, বিসিসি, বিআইটিএম, এলআইসিটি-র সহায়তায় প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবক-যুবতীদের ডিজিটাল যুগের উপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা হচ্ছে।
- ডিজিটাল খাতে রপ্তানি ২.৬ মিলিয়ন ডলারের বিপরীতে এখন ৮০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।
- মোবাইল ব্যাংকিংয়ে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা সোয়া ৬ কোটি।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **২০২১-২৩ সালের মধ্যে ফাইভ-জি চালু করা হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটি-সহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো হবে।**
- **ই-পাসপোর্ট এবং ই-ভিসা চালু করা হবে।**
- **শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।**
- **আর্থিক খাতের লেনদেনকে ডিজিটাল করা হবে।**
- **তথ্যপ্রযুক্তির সফটওয়্যার, সেবা ও ডিজিটাল যন্ত্রের রপ্তানি ৭ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে।**
- **বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ এবং সাবমেরিন ক্যাবল-৩ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।**
- **সামরিক বাহিনী, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ডিজিটাল সক্ষমতা বাড়ানো হবে।**
- **ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসংগত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে।**

৩.২২ সমুদ্র বিজয় : ব্লু-ইকোনমি – উন্নয়নের দিগন্ত উন্মোচন

সাফল্য ও পরিকল্পনা

বঙ্গোপসাগরে বহুমাত্রিক বিশাল সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র তিন বছরের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার 'দ্য টেরিটোরিয়াল ওয়াটারস অ্যান্ড মেরিটাইম জোনস অ্যাক্ট-১৯৭৪' প্রণয়ন করেন। মিয়ানমার ও ভারতের সাথে অমীমাংসিত সমুদ্রসীমা ছিল সমুদ্রে বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। জননেত্রী শেখ হাসিনার কূটনৈতিক সাফল্যের সুবর্ণ ফসল মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি। ফলে মিয়ানমারের সঙ্গে বঙ্গোপোসাগরে ২০০ নটিকেল মাইলের মধ্যে সমুদয় অর্থনৈতিক অঞ্চল ও তার বাইরে মহাদেশীয় বেষ্টনী এবং একইভাবে ভারতের সঙ্গে ৩৫৪ নটিকেল মাইল পর্যন্ত মহাদেশীয় বেষ্টনীর মধ্যে সকল প্রকার সম্পদের ওপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সর্বমোট ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সমুদ্র অঞ্চল লাভ করেছে, যা মূল ভূ-খণ্ডের প্রায় ৮০.৫১ শতাংশ।

সমুদ্রসম্পদ, যা ব্লু-ইকোনমি নামে অভিহিত, বাংলাদেশের উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। সমুদ্রবন্দর, জাহাজ নির্মাণ, নৌ-চলাচল, সাগরে মৎস্য চাষ, জলজ উদ্ভিদ, তেল-গ্যাস, খনিজসম্পদ আহরণ, সমুদ্রে ভেসে ওঠা নতুন চর/দ্বীপ, সামুদ্রিক পর্যটন শিল্প ইত্যাদি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে ব্লু-ইকোনমি বা সমুদ্রসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী মেয়াদে এই পরিকল্পনা অন্যতম অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত করা হবে।

৩.২৩ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সুরক্ষা

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ, বাংলাদেশের অবস্থান তার মধ্যে শীর্ষে। ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন, উষ্ণায়ন ও পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের অবস্থান ও পদক্ষেপ বিশ্ব-সমাজে বহুলভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

সাফল্য ও অর্জন

- ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান' বা জলবায়ু পরিবর্তন কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার অধীনে খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, গবেষণা কার্যক্রম, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো মোকাবিলা করার জন্য ৪৪টি প্রোগ্রামের আওতায় ১৪৫টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলারের বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। যার অধীনে ৪৪০টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- ডিসেম্বর ২০১৫ সালে 'ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেইমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'র ২১তম সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রির অনেক নিচে, সম্ভব হলে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখার লক্ষ্যে প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।
- ১৮ মিলিয়ন বা জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছে। কৃষিতে ডিজেলচালিত পানির পাম্পের বিকল্প হিসেবে সৌর সেচ পাম্প স্থাপন উৎসাহিত করা হচ্ছে। রান্নার কাজে ২০ লাখ উন্নত চুলা সরবরাহ করা হয়েছে।
- উপকূলবর্তী এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কম ক্ষয়ক্ষতির দিকটি বিবেচনায় নিয়ে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **বিশ্ব উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ এলাকা থেকে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে।**
- **ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড'-এ বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে।**
- **উৎপাদনশীল বনের আয়তন ২০১৫ সালের ১৩.১৪ হতে ২০ শতাংশে উন্নীতকরণ; ঢাকা ও অন্যান্য বড় নগরে বায়ুর মান উন্নয়ন এবং বিশুদ্ধ বায়ু আইন প্রণয়ন করা; শিল্প বর্জ্যের শূন্য নির্গমন/নিক্ষেপণ প্রবর্ধন করা; জলাভূমি সংরক্ষণ আইন মেনে বিভিন্ন নগরের জলাভূমি পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা করা; উপকূল রেখাব্যাপী ৫০০ মিটার চওড়া স্থায়ী সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।**
- **সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।**
- **দেশের বিস্তীর্ণ হাওড় ও ভাটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।**
- **উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল (Green Growth Strategy) গ্রহণ করা হবে।**

৩.২৪ শিশু কল্যাণ

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ বিধান সংবিধানে যুক্ত করেছিলেন। ১৭ মার্চ জাতির পিতার জন্ম দিবস আমাদের জাতীয় শিশু দিবস। বিগত ১০ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার শিশুর নিরাপত্তা বিধান এবং তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সাফল্য ও অর্জন

- ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শিশু আইন প্রণয়ন এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।
- শিশু অধিকার ও নিরাপত্তা বিধান করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং 'শিশু অধিকার সপ্তাহ' পালন করা হচ্ছে।
- 'জাতীয় শিশুনীতি-২০১১' এবং 'শিশু আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- পথশিশু দিবস, জাতীয় কন্যা শিশু দিবস, বাল্যবিবাহ নিরোধ দিবস পালনসহ অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০০৭ সালে ১৮ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৬৬ শতাংশ এবং ১৫ বছরের নিচে বাল্যবিবাহের হার ছিল ৩২ শতাংশ, যা ২০১৭ সালে ১৮ বছরের নিচে ৪৭ শতাংশ এবং ১৫ বছরের নিচে ১০.৭ শতাংশে নেমে এসেছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৃত্তি ও নানাবিধ কর্মকাণ্ড উন্নত ও প্রসারিত করা হবে।**
- **শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোর করে জড়িত করা হবে না। শিশু নির্যাতন বিশেষ করে কন্যাশিশুদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।**
- **পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা, হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশুসদন প্রতিষ্ঠা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা উন্নত ও প্রসারিত করা হবে।**

৩.২৫ প্রতিবন্ধী ও প্রবীণ কল্যাণ

প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীরা সমাজেরই অংশ। দেশে ১৬ লাখ প্রতিবন্ধী রয়েছে। আওয়ামী লীগ প্রতিবন্ধীদের মেধার বিকাশ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যা উন্নত ও প্রসারিত করা হবে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের উদ্যোগে জাতীয়ভাবে এবং জাতিসংঘেও অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও কল্যাণমূলক প্রস্তাব পাস করা হয়েছে।

সাফল্য ও অর্জন

- প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মূল ধারায় আনার জন্য প্রতিবন্ধী কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন পাস করা হয়েছে। ১০ লাখ প্রতিবন্ধী ভাতা এবং ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বৃত্তি পাচ্ছে।
- প্রতিবন্ধীদের বিশেষ করে অটিস্টিক শিশু-কিশোরদের কল্যাণে অটিজম ট্রাস্ট গঠনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে মেলার আয়োজন করা হয় যেখানে প্রতিবন্ধীদের তৈরিকৃত পণ্য প্রদর্শন ও বাজারজাত করা হয়।
- ইতোমধ্যে ১০৩টি প্রতিবন্ধীসেবা ও সাহায্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে, যার উপকারভোগী ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৬৪২ জন। ২০ হাজার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- সকল বিভাগীয় সদরে ১০টি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়েছে। ৬০০ প্রতিবন্ধীকে কারিগরি, সেলাই, নাচ ও গান, চারু ও কারুকলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য 'জব ফেয়ার'-এর আয়োজন করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দলিত ও অবহেলিত গোষ্ঠী

- হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে তাদের বিশেষ ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় এবং বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাদের বিশেষ ভাতা ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।
- বেদে, হরিজন, দলিতসহ সকল গোষ্ঠীর মানুষকে উন্নত জীবন-জীবিকার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক) শিশুদের সুস্বাস্থ্য, শিক্ষা, মর্যাদা ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা হবে। প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ, চিকিৎসা সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**

প্রবীণ কল্যাণ

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশে প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ছিল ১.১৩ কোটি, যা প্রতিবছর ৪.৪১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১.৩০ কোটি, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। পরিবার ও সমাজের প্রতি তাদের অবদান বিবেচনায় প্রবীণদের সার্বিক মৌলিক অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষায় বর্তমানে সরকার কাজ করে চলেছে।

সাফল্য ও অর্জন

- প্রবীণদের মর্যাদাসম্পন্ন, দারিদ্র্যমুক্ত, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে কর্মময়, সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিশ্চিত করতে সরকার 'সিনিয়র সিটিজেন নীতিমালা', 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩' এবং 'পিতামাতার ভরণ-পোষণ আইন-২০১৩' প্রণয়ন করেছে।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'সমন্বিত পেনশন কার্যক্রম' চালুর প্রস্তাবনা রয়েছে, যার আওতায় বয়স্ক ভাতা প্রদানের পাশাপাশি 'জাতীয় সামাজিক বীমা কর্মসূচি' এবং 'বেসরকারি ভলান্টারি পেনশন' চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **সামাজিক 'নিরাপত্তা-বেষ্টনি কার্যক্রম'-এ প্রবীণদের অন্তর্ভুক্তির বর্তমান সংখ্যা ও সহায়তার পরিমাণ সম্প্রসারণে বাস্তবতার আলোকে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।**
- **প্রবীণদের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণ, প্রবীণদের বিষয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পাঠ্যবই-এ আলাদা অধ্যায় সংযোজন, যানবাহন এবং আবাসিক স্থাপনাগুলোতে প্রবীণদের জন্য আসন/পরিসর নির্ধারণ, তৃণমূল পর্যায়ে প্রবীণদের জেরিয়াট্রিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ এবং হাসপাতাল, বিমানবন্দর, বিভিন্ন স্থাপনা ও যানবাহনে ওঠা-নামার ব্যবস্থা প্রবীণবান্ধব করে গড়ে তোলা হবে।**

৩.২৬ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি রোধ করা, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ করা, মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সাফল্য ও অর্জন

- সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ মূল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং স্মৃতি জাদুঘর, শিখা চিরন্তন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরকালীন বয়স ৬০ বছর করা হয়েছে।
- ৫৩টি জেলা ও ৩৮৩টি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ শেষ হয়েছে বা সমাপ্তির পথে।
- ২০০৯ সাল হতে পর্যায়ক্রমে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার হার মাসিক ৯০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে মাসিক ১০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং ১০ হাজার টাকা করে বছরে দুটি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা পর্যায়ক্রমে যাচাই-বাছাই করে ১ লাখ থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখে উন্নীত করা হয়েছে।

- বিভিন্ন শ্রেণির সর্বমোট ৭ হাজার ৮৩৮ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, শহিদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ পরিবারের মাসিক রাষ্ট্রীয় ভাতার পরিমাণ ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং ৬০ ও তদূর্ধ্ব বয়সের সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, বিশেষত দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসহ গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।**
- **দেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা, ইতিহাস বিকৃতি রোধ এবং প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিতকরণ, শহিদদের নাম-পরিচয় সংগ্রহ এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।**

৩.২৭ সংস্কৃতি

সংস্কৃতির ভেতর দিয়েই সভ্যতা, মানবতা, বিশ্বজনীনতা ও জাতীয়তা বিকশিত হয়। বাঙালির জাতিসত্তা সৃষ্টি ও বিকাশে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এবং পঁচাত্তরের পটপরির্তনের পর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে সংস্কৃতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে আওয়ামী লীগ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সাফল্য ও অর্জন

- বাংলা একাডেমির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- 'ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল আর্কাইভ' ও 'ডিজিটাল আর্ট ডিরেক্টরি অব বাংলাদেশ' শিল্পকলা একাডেমিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও গবেষণার কাজ করে যাচ্ছে।
- শান্তি নিকেতনে 'বাংলাদেশ ভবন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- শ্রীলংকার ক্যান্ডিতে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ জাদুঘরে 'বাংলাদেশ কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০০৯-১৭ সময়কালে ৫২৫ কোটি ১৪ লাখ টাকা ব্যয়ে হাছন রাজা একাডেমি নির্মাণ, পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ, জেলা গ্রন্থাগার নির্মাণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ, জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, ভৌত অবকাঠামোর আধুনিকায়নসহ ৯৬টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২৫টি প্রকল্প ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংরক্ষণ, মর্যাদা রক্ষা ও চর্চার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- লোকজ সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে।
- ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৩৯টি জেলায় জেলা গণগ্রন্থাগার এবং ১,২২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হচ্ছে।
- ৭টি জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির বিকাশ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মাতৃভাষা ও বর্ণলিপি সংরক্ষণ, পুস্তক প্রকাশনা, অ্যালবাম ও ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে।
- ১১ হাজার ৪৭৬ সংস্কৃতিসেবীর অনুকূলে ১৪ কোটি ৩৫ লাখ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলা নববর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালনের জন্য উৎসব বোনাস প্রদান করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত নীতি ও কর্মপরিকল্পনা অব্যাহত থাকবে।**
- **বাংলা ভাষা সাহিত্য, চারু ও কারুকলা, সংগীত, যাত্রা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ শিল্পের সব শাখার ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন ও চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানো হবে।**

৩.২৮ ক্রীড়া

ক্রীড়া চর্চা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। দেশের যুবসমাজকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত এবং সুস্থ দেহ ও সাহসী মনের অধিকারী জনবল গড়ে তুলতে ক্রীড়া বিশেষ ভূমিকা রাখে। আওয়ামী লীগ প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ, যোগ্য ক্রীড়া প্রশিক্ষক, ক্রীড়ার অবকাঠামো ও ক্রীড়ামোদি জাতি গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এ-লক্ষ্য অর্জনে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

সাফল্য ও অর্জন

- বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই বাংলাদেশ গৌরব জাগানো অবস্থান করে নিয়েছে। ফুটবলেও সার্ক অঞ্চলে ভালো অবস্থানে রয়েছে। হকিসহ অন্যান্য খেলার মান বৃদ্ধির জন্য সহায়তা জোরদার করছে।
- সরকার কর্তৃক বিশেষ সহায়তার আওতায় ৩১টি খেলার ইভেন্টে তৃণমূল পর্যায় থেকে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।
- জাতীয় পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনূর্ধ্ব-১৭ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।

- প্রাথমিক পর্যায়ে ফুটবলে ছেলেদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ও মেয়েদের জন্য বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ আয়োজন করার মাধ্যমে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বের হচ্ছে।
- ৫,৫৬৪ লাখ টাকা ব্যয়ে দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার।
- সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তর করে সেখানে আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে।
- টেবিল টেনিস, তায়কোয়ান্দো, কারাতে, উশু এবং ভলিবল খেলার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিকেএসপি-তে ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **বিশ্ব ক্রিকেটে বর্তমানে বাংলাদেশের গৌরব জাগানো অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার সাথে সাথে ফুটবল হকিসহ অন্যান্য খেলা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে।**
- **ক্রীড়া ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে পরিকল্পিত উদ্যোগ নেওয়া হবে।**
- **প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধুলা ও শরীর চর্চাকে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।**

৩.২৯ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায়

স্বাধীন দেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে সংবিধান জাতিকে উপহার দিয়েছেন, তাতে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও অনুন্নত সম্প্রদায়সহ সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও অধিকার সুনিশ্চিত করেন। পঁচাত্তরে সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর সংবিধান পরিবর্তন করে দেশকে পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হয়। ২০১১ সালে সংসদে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী পাস করে আওয়ামী লীগ '৭২-এর সংবিধানের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-জাতিগোষ্ঠী ও উপজাতিদের অধিকার ও মর্যাদার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে বৈষম্যমূলক আচরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান এবং তাদের জীবন, সম্পদ, উপাসনালয়, জীবনধারা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা আবারও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার– এই মর্মবাণীরই প্রতিফলন ঘটেছে।

সাফল্য ও অর্জন

- ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের জমি, বসতভিটা, বনাঞ্চল, জলাভূমি ও অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- পার্বত্য জেলাগুলোর উন্নয়নে ইতোমধ্যে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখা, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলোর সৌন্দর্য সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই তিন জেলায় পর্যটন শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্পের বিকাশে ইতোমধ্যে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন এবং এই আইনের অধীনে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে চুক্তির বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় আঞ্চলিক পরিষদ এবং জেলা পরিষদের নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। ক্ষমতায়নের এই ধারা চুক্তির শর্তানুযায়ী অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণকালে সমতল ভূমির ন্যায় বাজার মূল্যের তিন গুণ ক্ষতিপূরণ জমির মালিক যাতে পায়, সে-জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে।**
- **জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু বিশেষ সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হবে।**
- **সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জমি, জলাধার ও বন এলাকায় অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। অনগ্রসর ও অনুন্নত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, দলিত ও চা-বাগান শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ কোটা এবং সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত থাকবে।**
- **সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করা হবে।**
- **ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।**

৩.৩০ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ

আওয়ামী লীগ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের অধিকার সুরক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। ইতোমধ্যে সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের চেতনায় দেশে গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গণমাধ্যমের সকল শাখা ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। ৩৩টি টেলিভিশন (৪৪টি

লাইসেন্সপ্রাপ্ত), ১৬টি এফএম রেডিও (২৮টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত), ১৭টি কমিউনিটি রেডিও (৩২টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত)-সহ অসংখ্য সংবাদপত্র ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের মাধ্যমে দেশে তথ্যের অবাধ চলাচল অব্যাহত আছে।

সাফল্য ও অর্জন

- সাংবাদিকদের জন্য নবম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বস্তরের সাংবাদিকদের জন্য এর বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে অনেক সাংবাদিককে আর্থিক ও চিকিৎসা সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এ সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- সাংবাদিকতা পেশা ও স্বাধীনভাবে তথ্য সরবরাহে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট যেন কিছুতেই বাধা না হয়, সে-বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- দেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হয়েছে। পেশায় নিয়োজিত সাংবাদিকদের সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমার পাশাপাশি মাস্টার্স ডিগ্রি ও জাতীয় গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। পিআইবি-তে অনলাইন ট্রেনিং কোর্স চালু করায় ঘরে বসে শত শত সাংবাদিক সাংবাদিকতায় প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **সাংবাদিকদের জন্য ফ্ল্যাট প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। জাতীয় প্রেসক্লাবের প্রস্তাবিত ২১ তলা ভবন নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা হবে।**
- **সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিকাশের ফলে এর অপব্যবহার করে গুজব ছড়িয়ে এক শ্রেণির মানুষ সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করে। গুজব শনাক্ত ও সত্য তথ্য প্রচারের মধ্যদিয়ে গুজব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করা হবে।**
- **জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন গঠন করে সকল গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা রোধ ও জনগণের সত্য তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতায় সমৃদ্ধ সাংবাদিকতা ও সংবাদমাধ্যম উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে।**
- **তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে অধিকতর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় সাংবাদিকদের উৎসাহিত করা এবং এ-বিষয়ে প্রয়োজনীয় ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
- **পেশাগত দায়িত্ব পালনে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।**
- **সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণে বৈষম্যমূলক নীতি, দলীয়করণ বন্ধ এবং সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে তার বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে। গণমাধ্যমবান্ধব আইন করা হবে। সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কোনো আইনের অপপ্রয়োগ হবে না।**
- **পেশাদার সাংবাদিকদের কল্যাণের জন্য প্রচলিত উদ্যোগের পাশাপাশি নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে।**

৩.৩১ প্রতিরক্ষা : নিরাপত্তা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা সুরক্ষা

আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এখন শক্তিশালী এবং অভ্যন্তরীণ স্বশাসন, শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সমুন্নত। দেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছিলেন। সেই নীতিমালার ভিত্তিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার যে নীতি নিয়েছিল, তা অব্যাহত থাকবে।

সাফল্য ও অর্জন

- সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে আধুনিক সমরাস্ত্র, যানবাহন এবং প্রযুক্তির সম্মিলন ঘটানো ছাড়াও সেনাসদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।
- সশস্ত্র বাহিনীতে পদোন্নতি, পদসমূহের শ্রেণিবিন্যাস উন্নত করা এবং সদস্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ গৃহীত বহুমুখী কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- সিলেট, রামু (কক্সবাজার) ও বরিশালে ৩টি ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠা, ৩টি পদাতিক ডিভিশন ও পদ্মাসেতু কম্পোজিট ব্রিগেডসহ বহু ইউনিট গঠন করা হয়েছে।
- আধুনিকায়ন ও সমরশক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন প্রজন্মের ট্যাংক, সেলফ প্রপেলড গান, আধুনিক ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টার, লোকেটিং রাডার ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে।
- দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমাদের নিজস্ব শিপইয়ার্ডে তৈরি যুদ্ধজাহাজ, বিদেশ থেকে নতুন যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সংযোজন এবং সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী গঠন ও নতুন নেভাল কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পটুয়াখালীতে একটি পূর্ণাঙ্গ নৌ-ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে।
- বিমান বাহিনীর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আকাশ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিমান বাহিনীতে প্রথমবারের মতো ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রসহ সর্বাধুনিক সরঞ্জাম এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। যুদ্ধবিমানসহ বিভিন্ন সরঞ্জামের সুষ্ঠু ও সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিক্যাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে আছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অনন্য অবদান রাখার জন্য সারাবিশ্বে প্রশংসা অর্জন এবং দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবসরোত্তর ছুটি ছয় মাস থেকে এক বছর করা হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা বাহিনীর কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের অবসর ভাতা ৩০ শতাংশ পেত, এখন তা ১০০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- সামরিক বাহিনীর জেসিও এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পদকে দ্বিতীয় শ্রেণি হতে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করা এবং বেতনের ২০ শতাংশ বাড়ি ভাড়া অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সার্জেন্ট পদকে তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়েছে।

- এসএসএফ, পিজিআর, ডিজিএফআই, এনএসআই, র‍্যাব ও বিজিবি-র দশম গ্রেড ও নিম্নপদের কর্মচারীগণ ঝুঁকি ভাতা পাচ্ছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী আধুনিকায়নের চলমান প্রক্রিয়া যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সর্বতোভাবে অব্যাহত থাকবে।**
- **প্রতিরক্ষা বাহিনীর অভ্যন্তরীণ স্বশাসন, শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সমুন্নত রাখা হবে। জ্যেষ্ঠতা, মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা হবে।**
- **সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধাসহ গৃহীত বহুমুখী কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।**
- **জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সমুন্নত রাখা ও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।**
- **সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের কল্যাণের জন্য চলমান কাজ চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।**

৩.৩২ পররাষ্ট্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। জাতির পিতার আদর্শ ও সংবিধানের ২৫নং অনুচ্ছেদে বিধিবদ্ধ নীতি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয়'-এর আলোকে সকল রাষ্ট্রের সাথে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা হচ্ছে। বিএনপি-জামাত আমলের দুর্নীতিগ্রস্ত 'সন্ত্রাসী রাষ্ট্র', 'অকার্যকর রাষ্ট্র' প্রভৃতি সব কলঙ্ক ঘুচিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় স্বার্থে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

সাফল্য ও অর্জন

- বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জঙ্গিবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না।
- ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা মীমাংসা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির সাফল্যের এক বিরাট মাইলফলক।
- দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান করে ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও ছিটমহল হস্তান্তর সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের সাথে সীমান্ত মীমাংসা সাম্প্রতিক বিশ্বে উদাহরণ স্থাপন করেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী স্বাক্ষরিত স্থল সীমান্ত চুক্তি-১৯৭৪ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মোট ১১১টি ছিটমহলে ১৭,১৬০.৬৩ একর জমি বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ভারতের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে বহুমুখী সহযোগিতা জোরদার হচ্ছে।

- মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে দ্বি-পাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে বহুমুখীকরণের উদ্যোগের অংশ হিসেবে সার্ক, বিমসটেক ডি-৮, আসিয়ান রিজিওয়াল ফোরাম (এআরএফ), এশিয়া কো-অপারেশন, এশিয়া ইউরোপ মিটিংসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল ফোরামে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- রাশিয়া ও চীনসহ আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের বহুমুখী সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।
- ২০১১ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও শান্তির জন্য 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন মডেল' সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। একই বছর বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি' প্রস্তাবটি পাস হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী 'অটিজম সচেতনতা' সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব ২০১২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে।
- কূটনৈতিক কার্যক্রমের প্রসারে ২১টি মিশন ও সাব-মিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও পরিকল্পনা

- **আন্তর্জাতিক যে কোনো বিরোধ শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।**
- **ভারতের সাথে তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন এবং দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। ভারত-ভুটান-নেপালের সাথে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও অভিন্ন নদীর অববাহিকাভিত্তিক যৌথ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।**
- **বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে জঙ্গিবাদ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো শক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা হবে।**
- **রাশিয়া, চীন এবং আশিয়ান দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার করা হবে।**
- **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডাসহ উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক আরও জোরদার ও ব্যাপক বিস্তৃত করা হবে।**
- **মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোসহ বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে। এদেশগুলোর সাথে নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমন প্রভৃতি বিষয়ে বাংলাদেশের জোরালো ভূমিকা থাকবে। মুসলিম উম্মাহর সংহতি এবং ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) কাঠামোয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করা হবে।**
- **অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।**

রোহিঙ্গা সংকট

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করার কারণে ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। শরণার্থী বহন করার জন্য অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণহত্যা ও জাতিগত নিধন থেকে সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণ নিয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

- সরকার রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিশুদের পরিচর্যা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে।
- সরকারের তৎপরতার ফলে বিভিন্ন দেশ এবং জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা রোহিঙ্গাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেছে এবং তাদের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে।
- রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও টেকসই সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বন্ধু-রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
- রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পাঁচ-দফা প্রস্তাব পেশ করেছেন। রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে নিরাপদ সম্মানজনক ও স্থায়ীভাবে ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক-নির্দেশনায় দ্বি-পাক্ষিক আলোচনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে মিয়ানমারের সাথে সফলভাবে প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন করেছে।
- রোহিঙ্গাদের স্থায়ী প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে এ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করেছে।

৩.৩৩ এনজিও

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বশাসিতভাবে তাদের নিজস্ব বিধিমোতাবেক পরিচালিত হবে। দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান বিষয়ে নিজস্ব বিধি ও রীতি অনুযায়ী কাজ করার অধিকার অব্যাহত রাখা হবে। সরকার বিধিবদ্ধ এনজিও প্রতিষ্ঠানের অর্জন বা ব্যর্থতা মূল্যায়ন করবে।
- সরকারি প্রতিষ্ঠান/বিভাগ স্থানীয় সরকারের সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছামূলক সমন্বয় জোরদার করা হবে। অর্থায়নকারী অন্যান্য এনজিও-র সকল কার্যক্রম ও আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছ এবং স্থানীয় জনগণ ও সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
- এনজিও সংস্থা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে অথবা শিল্প ও বাণিজ্যে ভূমিকা রাখতে গেলে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়বে এবং এনজিও হিসেবে কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে না। তাদের লভ্যাংশের যে অংশ জনসেবায় ব্যয় হবে সেক্ষেত্রে কর রেয়াতির ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৪. এমডিজি অর্জন এবং এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন) বাস্তবায়ন কৌশল (২০১৬-৩০)

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন কর্মসূচি (২০০১-১৫) বাস্তবায়নের প্রস্তুতি শুরু করে। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় যাওয়ার পরে এমডিজি কর্মসূচি স্থবির হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগ পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর এমডিজি কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন– এ ৪টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে বিশ্বে 'রোল মডেল' হিসেবে প্রশংসিত হয়। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা হতে পুরস্কার লাভ করেছে। অন্য ৪টি লক্ষ্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, এইডস-ম্যালেরিয়া-অন্যান্য রোগব্যাধি দমন, পরিবেশগত স্থিতিশীলতা, সার্বিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও আমরা সাফল্য অর্জন করেছি।

এসডিজি বাস্তবায়নে গৃহীত পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন পর্বের শেষে জাতিসংঘ ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর-পরবর্তী ১৫ বছরের জন্য টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি (সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট গোল-এসডিজি ২০১৬-৩০) গ্রহণ করে। টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি এবং আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছে, যথা– উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা (ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড রিভিউ) কমিটি গঠন; প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্টকরণ; বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং Monitoring and Evaluation Framework প্রণয়ন; টেকসই উন্নয়নে অর্থসংস্থান কৌশল (SDGs Financing Strategy) প্রণয়ন; ২০১৭ সালে জাতিসংঘে স্বেচ্ছাভিত্তিক জাতীয় পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন; সকল পর্যায়ের জনগণকে সম্পৃক্ত করা (Whole Society Approach)– এনজিও, সিভিল সোসাইটি, সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ, যুবসমাজ ও উন্নয়ন সহযোগী যার অন্তর্ভুক্ত।

টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ১৬টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৫-৩০ কালপর্বে টেকসই কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণমুখী লক্ষ্যমাত্রা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন : (ক) দারিদ্র্য ২৪.৩ হতে ৯.৭ শতাংশে হ্রাস করা হবে, হতদরিদ্র হ্রাস পাবে ১২.৯ হতে ৩ শতাংশের নিচে; (খ) বিদ্যুতের সুবিধা ভোগ করবে শতভাগ জনগণ (২০১৫ সালে ছিল ৭৮ শতাংশ); (গ) শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ২৫ শতাংশ (২০১৫-১৬ সালে ১৪.৪ শতাংশ);

শিশু ও মাতৃমঙ্গল : (ঘ) অপুষ্টির ব্যাপকতা ১৬.৪ শতাংশ হতে হ্রাস পাবে ১০ শতাংশে বা তার চেয়ে কম; (ঙ) অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের খর্বিত বিকাশ ৩৬.১ হতে ১২ শতাংশে হ্রাস পাবে; (চ) পুষ্টি ঘাটতিজনিত ক্ষীণতা বা খর্বকায় ১২ শতাংশ হতে হ্রাস পাবে ৫ শতাংশে বা তার নিচে; (ছ) শিশুমৃত্যুর হার কমবে ১৮১ হতে ৭০ (প্রতি ১,০০,০০০ জন্ম); (জ) প্রসবকালে

দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি ৪২.১ শতাংশ হতে বাড়বে ৮০ শতাংশে; (ঝ) শতভাগ জন্মনিবন্ধন (২০১২-১৩ সালে ৩৭ শতাংশ); (ঞ) কিশোরী মায়ের সংখ্যা হবে ৫০, এখন এই সংখ্যা ৭০ (প্রতি হাজারে); (ট) শতভাগ শিশু ইমুনাইজেশন সুবিধা পাবে (৭৮ শতাংশ ছিল ২০১৪ সালে); (ঠ) ১৫ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহিত মেয়ের সংখ্যা নেমে আসবে শূন্যের কোটায় (২০১২-১৩ সালে ছিল ২৩.৮ শতাংশ), ২০-২৪ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহিত নারীর সংখ্যা ১০ শতাংশে হ্রাস পাবে;

শিক্ষা : (ড) প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত শতভাগ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন; (ঢ) কারিগরি প্রশিক্ষণ পাবে ৩০ শতাংশ যুবক (বর্তমানে পায় মাত্র ১৪ শতাংশ); (ণ) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলেমেয়ের অনুপাত হবে ০.৮০, বর্তমান অনুপাত ০.৬৫; (ত) জাতীয় আয়ের ১ শতাংশ গবেষণার জন্য ব্যয় (বর্তমানে ০.৩ শতাংশ);

স্বাস্থ্য/জনস্বাস্থ্য : (থ) স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ ১৩.৭ হতে ১৫ শতাংশে বৃদ্ধি পাবে; (দ) শতভাগ জনগণের জন্য থাকবে নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাষণ ব্যবস্থা (বর্তমান ৬১ শতাংশ) এবং নিরাপদ পানীয় সরবরাহ (বর্তমান ৮৭ শতাংশ);

নারীর ক্ষমতায়ন : (ধ) জাতীয় সংসদে নারী সদস্য হবে ৩০ শতাংশ (বিদ্যমান ১৬.৭ শতাংশ), স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে প্রত্যক্ষ ভোটে নারী সদস্য ৩৩ শতাংশ।

আগামী দিনে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৫. ব-দ্বীপ বা ডেল্টা পরিকল্পনা-২১০০

বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে। জলবায়ুর ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' শতবর্ষের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে পন্থা অনুসরণ করে নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞদের যৌথ সহায়তায় ২০১৮ সালে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এটি মূলত পরিবেশের সাথে অভিযোজনভিত্তিক কারিগরি এবং অর্থনৈতিক মহাপরিকল্পনা, যা উন্নয়ন ফলাফলের ওপর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা নীতিতে আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ঝুঁকির মধ্যে উচ্চতর ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন এবং ব-দ্বীপ সম্পর্কিত অন্যান্য অভিযোজন তথা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটি ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জন করতে সহায়ক হবে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সাল নাগাদ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয়ের যোগসূত্র সৃষ্টি করবে।

৬. জননেত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

দেশের উন্নয়ন হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গীকার, নেতৃত্ব ও সাযুজ্যপূর্ণ নীতিমালার গভীর সংমিশ্রণ। গত দুই মেয়াদে নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের ফলে একটি নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়ে উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব অর্জন সাধিত হয়েছে, তা প্রধানত প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার অদম্য সাহস, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের ফসল। তিনি দেশকে মর্যাদা ও সম্মানে বিশ্ব পরিমণ্ডলে এক অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। সমসাময়িক রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা কেবল আওয়ামী লীগের নয়, সারাদেশের শক্তি ও সম্পদ, দুটোই। বিশ্ব পরিমণ্ডলে তিনি এখন এক অনন্য কণ্ঠস্বর। তার দৃঢ় মনোবল, সাহসী নেতৃত্ব, ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাকে দেশে ও বিদেশে তুমুল জনপ্রিয় করে তুলেছে। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, তরুণদের অনুপ্রেরণা ও জঙ্গি প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাকে অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

- সম্প্রতি ২০১৮-এর এপ্রিল মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'গ্লোবাল উইমেনস লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮'-এ ভূষিত হন।
- রোহিঙ্গাদের আশ্রয়দানে মানবিক ও দায়িত্বশীল নীতির জন্য অনন্য নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বৈশ্বিক সংবাদ সংস্থা ইন্টার প্রেস সার্ভিস (আইপিএস) 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং নিউইয়র্ক, জুরিখ ও হংকংভিত্তিক একটি অলাভজনক ফাউন্ডেশনের নেটওয়ার্ক গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন '২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট' সম্মাননা প্রদান করে।
- এই মানবিক ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন।
- ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ কর্তৃক লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'প্লানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার প্রদান করা হয়।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অসামান্য সাফল্যের জন্য তাকে আইএফআরসি-র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।
- ২০১৫ সালে জাতিসংঘের পরিবেশবিষয়ক সর্বোচ্চ সম্মান 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্যা আর্থ' পুরস্কার গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা।
- টেকসই উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে অবদানের জন্য ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন (আইটিইউ) পুরস্কার লাভ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ১৯৯৯ সালে ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সেরেস পদক' প্রদান করা হয়।

- দারিদ্র্য ও অপুষ্টি দূরীকরণে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করায় ফাও বাংলাদেশকে 'ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড' পদকে ভূষিত করে, যার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি মিলেছে ২০১৫ সালে শেখ হাসিনার 'ফাও এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' পদক লাভ করার মধ্যদিয়ে। এটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশাল সাফল্যের স্বীকৃতি।
- নারী শিক্ষা ও নারীদের ক্ষমতায়নে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি ইউনেস্কোর 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কার লাভ করেন ২০১৪ সালে।
- দেশে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড-২০১৩' প্রদান করা হয়।
- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বখ্যাত 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পদক-২০০৯', 'নেতাজী মেমোরিয়াল পদক-১৯৯৭', 'এম কে গান্ধী পদক-১৯৯৮' লাভ করেন।
- বিশ্বশান্তি রক্ষায় দেশরত্ন শেখ হাসিনার অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত। ইউনেস্কোর 'ফেলিক্স হুফে বইনি' পদক শান্তির দূত শেখ হাসিনার বিশ্ব পরিসরে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের পরম স্বীকৃতি।
- শেখ হাসিনার সুতীক্ষ্ণ মেধা ও চৌকস নেতৃত্বের স্বীকৃতি মিলেছে একাডেমিক অঙ্গনেও। সম্মানসূচক ডিগ্রিগুলোর মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও জাপানের ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব লজ', যুক্তরাজ্যের ডান্ডি আবার্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব লিবারেল আর্টস', বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দেশিকোত্তম' উপাধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব লজ' ও বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর অব সায়েন্স' ডিগ্রি। তাছাড়াও পিপল্স ফ্রেন্ডশিপ ইউনিভার্সিটি অব রাশিয়া, সেন্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্রাসেলসের ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি, প্যারিসের ডাউফিন ইউনিভার্সিটি ও ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করে।
- শেখ হাসিনার প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও সাহসী নেতৃত্বের প্রভাব এতটাই সুবিস্তৃত যে, ২০১৬ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ফরচুন ম্যাগাজিনের দৃষ্টিতে তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রভাবশালী নেতাদের তালিকায় দশম স্থানে রয়েছেন এবং ওআইসি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তিনিই একমাত্র নারী নেতা হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। ২০১৮ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনের মতে, বিশ্বের ক্ষমতাধর শত নারীর তালিকায় রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা ২৬ নম্বরে স্থান করে নেন।
- শুধু মেধা ও দক্ষতায় নয়, সততায়ও শেখ হাসিনা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিক্স' নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৭৩ দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে। সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান তৃতীয়। জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের কাতারে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতিচিত্র আজ উজ্জ্বল ভাস্বর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন আধুনিক বাঙালি জাতিসত্তার নিপুণ কারিগর, তারই সুযোগ্য কন্যা আওয়ামী লীগপ্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা তেমনি বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় এক অবিসংবাদিত দ্যুতিময় নেত্রী। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতেও তার অনবদ্য ভূমিকা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তার সৃজনশীল অবদান এবং কেবল রাজনৈতিক কূটনীতিতে নয়, অর্থনৈতিক

কূটনীতিতেও ঈর্ষণীয় সাফল্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। দেশের সকল মানুষের জন্য তার উন্নয়ন-ভাবনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা আজ বিশ্বের উন্নয়ন সহযোগীদের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল, যা বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য এক কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যস্থল। শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের দিক-নির্দেশক ও নৌকার মূল চালিকাশক্তি। উন্নয়নশীল বিশ্বের একজন অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির ফলেই দেশবাসীর মনে আজ প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আগামী দিনের সরকার পরিচালনায় জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তার দিক-নির্দেশনায় বিগত দুই মেয়াদের নির্বাচনী ইশতেহারের ধারাবাহিকতায় এবারের ইশতেহার **'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'**-এর সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

৭. দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান

প্রিয় দেশবাসী,

আলোকোজ্জ্বল পথে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার ১০ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। আমরা গত ১০ বছরে পরপর দুই মেয়াদে নিরলস পরিশ্রম করে কাজ করে জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছি। আপনাদের নিরঙ্কুশ সমর্থন ও সহযোগিতায় ২০০৮ সালে ভোট ও ভাতের অধিকার সম্বলিত 'দিনবদলের সনদ' এবং ২০১৪ সালের 'শান্তি গণতন্ত্র উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে' এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার পূরণ করতে পেরেছি। এ কৃতিত্ব কেবল আপনাদের ভোটে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সরকারের নয়, এর গর্বিত অংশীদার আপনারা, এদেশের আপামর জনগণ। এ-জন্য আপনাদের জানাই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের পবিত্র সংবিধান অনুযায়ী জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। আশা করি, আমাদের পরিশ্রম ও উন্নয়ন কাজের প্রতি সুবিবেচনা করে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের স্বার্থে আগামী পাঁচ বছরের জন্য জনগণ পুনরায় আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দেবেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সচেষ্ট থেকেছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাযজ্ঞে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিশ্ববাসীর চোখে উন্নয়নের এক অভূতপূর্ব রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সৃষ্টি হয়েছে সরকার, আওয়ামী লীগ ও জনতার পবিত্র মেলবন্ধন, যাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে হবে। জাতিসংঘসহ বিশ্ব পরিমণ্ডলে উন্নয়ন-অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বিস্ময়। এটা এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে জনগণ কিছু পায়। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও সমৃদ্ধির সকল লুক্কায়িত সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে জনগণের দল আওয়ামী লীগ।

আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে, ২০০৮ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকার রূপকল্প-২০২১ আমরা নতুন প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে উৎসর্গ করেছিলাম। ২০১৪ সালের নির্বাচনী অঙ্গীকার রূপকল্প-২০৪১ আমরা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আজ তরুণ যুবকরা মুক্তিযোদ্ধাদের মতো আবারও মাথা তুলে গর্বভরে দাঁড়িয়েছে। এবারের নির্বাচনী অঙ্গীকার তাই নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার। একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামরত তরুণ-তরুণীরাই এই অঙ্গীকারকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, **তারুণ্যের শক্তি – বাংলাদেশের সমৃদ্ধি**। তরুণ প্রজন্মসহ দেশবাসীর সাথে আমরা অতীতেও ছিলাম, বর্তমানেও আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আমরা ২০২৩ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য আপনাদের মহান রায় প্রার্থনা করছি। এরই মধ্যে ২০২০-২১ সালে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও তারই সূচিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ৫০ বছর উদযাপন করব। এই মহান কর্মকাণ্ডে আপনারা অতীতের মতোই জোরালো সমর্থন দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন– এই কামনা করছি। উন্নত বাংলাদেশ আমাদের প্রত্যয়, দেশপ্রেম আমাদের চেতনা, জনসেবা আমাদের কর্তব্য। আমাদের অগাধ বিশ্বাস সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি

সুবিচার ও সুবিবেচনা করে আগামী একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিয়ে আপনারা আরেকবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে দেশ সেবার সুযোগ দেবেন। এ পর্যন্ত আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করতে পেরেছি, তা যাতে আরও টেকসই, সুসংহত করে প্রতিটি মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায় সে-জন্য সরকারের ধারাবাহিকতা দরকার। একটি অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় ফিরে এসে আমরা সবাইকে নিয়ে আমাদের সকল আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে চাই।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা দেখেছেন, আমরা শুধু কথায় নয়, জনগণের কল্যাণে একনিষ্ঠভাবে কাজে বিশ্বাসী। আমাদের এবারের অঙ্গীকার আমরা টেকসই বিনিয়োগ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন করব। এ-লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষা ও সেবা খাত সম্প্রসারিত হবে, তারুণ্যে ভরপুর যুবসমাজ দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে দেশ গঠনে অবদান রাখবে। প্রতিটি গ্রামে শহরের আধুনিক সুবিধাদি পৌঁছে যাবে। কৃষি যান্ত্রিকায়নের ফলে মানুষের কায়িক শ্রমের লাঘব হয়ে শ্রম দক্ষতা বেড়ে যাবে। আমরা কৃষি-ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করে সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য-পুষ্টির ব্যবস্থা করব। আমরা উত্তরবঙ্গ থেকে মঙ্গা দূর করেছি, এবার দেশ থেকে অবশিষ্ট দারিদ্র্য চিরতরে বিদায় করব। সবার জন্য সুচিকিৎসা ও সকল স্তরে মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধার সম্প্রসারণ করা হবে। **'আমার গ্রাম হবে আমার শহর'**। আগামী দিনের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ইতোমধ্যে শুরু হওয়া বৃহৎ প্রকল্পসমূহের দ্রুত বাস্তবায়ন ও সমুদ্রসম্পদের আহরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর সহায়ক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে সংকল্পবদ্ধ।

ইন্‌শাল্লাহ্ আপনাদের মহান রায় নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে এলে আমরা দেশ থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মাদক, সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি নির্মূল করে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনকে সুসংহত করব। আমরা সমাজের সকল পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতায়নে বদ্ধপরিকর। সেবামুখী দক্ষ জনপ্রশাসন ও জনহিতৈষী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গড়ে তুলে দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের জন্য শান্তিশৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা বিধান করে যাব।

আমরা বিভেদ, হানাহানি, জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসন্ত্রাস, অবরোধ বিশৃঙ্খলার রাজনীতি চাই না। চাই গণতান্ত্রিক পরিবেশে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। এ নির্বাচনে আমরা জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে এখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাতীয় চার নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে এমন এক বাংলাদেশ গড়ে তুলি যেখানে মানুষের মৌলিক সব চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে, গড়ে উঠবে সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, যার যার ধর্ম পালনে স্বাধীনতা ও সম-অধিকার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, তরুণদের শ্রম ও মেধার সৃজনশীল বিকাশ, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, শহর ও গ্রামের বৈষম্য দূরীকরণ, দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্ক উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণ-রাষ্ট্র। গত ১০ বছরের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা

অব্যাহত রাখতে আপনারা অতীতের মতো এবারও আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করবেন− এ আহ্বান জানাচ্ছি।

এবারও ইন্‌শাল্লাহ্ আওয়ামী লীগের নৌকার পক্ষে গণজোয়ার উঠেছে। এদেশের মানুষ মায়ের ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেয়েছে নৌকার জন্য। স্বাধীন দেশ পেয়েছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে নৌকায় ভোট দিয়ে। দেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে নৌকার জন্য, পরমাণু যুগে প্রবেশ নৌকার হাত ধরে, স্যাটেলাইট যুগে প্রবেশ করেছে নৌকার কারণেই। আমাদের আহ্বান, সব ভেদাভেদ ভুলে সম্মিলিতভাবে দেশ ও জনগণের স্বার্থে আপনারা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নৌকা, বঙ্গবন্ধুর নৌকা, শেখ হাসিনার নৌকার পক্ষে রায় দিয়ে উন্নয়নের চাকাকে আরও বেগবান করুন।

লাখ লাখ শহিদের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করুন। গড়ে তুলুন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নলালিত সোনার বাংলা। পরিশেষে, আবারও আপনাদের সমর্থন চাই, সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের পক্ষে ভোট চাই। নৌকা মার্কায় ভোট চাই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ্‌র কাছে সেই দোয়া করি।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রত্যয় ও প্রতিশ্রুতি

‘যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি−
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।’

− সুকান্ত ভট্টাচার্য

www.albd.org

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭৭৮৮১, ৯৬৭৭৮৮২, ৮৬৫২৩৮৮, ফ্যাক্স : ৮৬২১১৫৫
ই-মেইল : alpartyoff@hotmail.com